স্বর্গগত দেবাত্মা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম্ম-জীবন।

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।
"কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জান"
(গীতা তৃতীয় অধ্যায় ১৫শ শ্লোক)

১৯।৩ ছকুখানসামা লেন হইতে
ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়ের
অধ্যক্ষ দ্বারা বিরচিত।

ও

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী
দ্বারা প্রকাশিত।
কলিকাতা।

১৩২২

মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা—১।০
উত্তম কাগজের মলাটে ঐ—১৲

PRINTED BY J. BANERJI
THE LAWRENCE PRINTING WORKS
3, Ramaprosad Roy Lane, CALCUTTA

অবতরণিকা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়ে" তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে আলোচনা হইয়া আসিতেছে; এবং সময়ে সময়ে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া উক্ত প্রচার-কার্য্যালয়ের ব্রত পালনে সহায়তা করিতেছে।

আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা যে উক্ত মহাপুরুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করি। তাহা একসঙ্গে করিতে গেলে গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে; একারণ তাঁহার "ধর্ম্ম-জীবন" ও "কর্ম্ম-জীবন" পৃথক পৃথক ভাবে রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। আর আমরা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাও দেখিলাম যে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন-বৃত্তান্ত ও তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা বর্ণন করিতে গেলে, অনেক অনুশীলন, চিন্তা ও তত্ত্বানুসন্ধানজনিত উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়। তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উক্ত কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, প্রাগুক্ত পুণ্যশ্লোক মহাত্মার শুভ্রজ্যোতিঃপূর্ণ ও মহাভাবসম্পন্ন জীবনালোকের নিকট আমাদের ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তাহা খদ্যোতবৎ প্রতীয়মান হয়। তথাপি তাঁহার ধর্ম্মজীবন গ্রন্থখানি পরিসমাপ্তিহেতু আমাদের হৃদয়ে একান্ত প্রয়াস

বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যথাযথভাবে তাহার সংসিদ্ধিতে উপনীত হওয়া বিস্তর সময় সাপেক্ষ।

সাধু মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করা বড়ই গুরুতর কার্য্য। আমরা এত অযোগ্য হইয়াও কেন যে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলাম তদুত্তরে আমাদের বিনীত বক্তব্য এই যে মহর্ষির জীবদ্দশায় আমাদের দুর্ব্বল মস্তক তাঁহার পদরজঃ ও আশীর্ব্বাদ যে পরিমাণে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহারই বলে আমাদের এই চেষ্টা। এই চেষ্টা ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের জীবনের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ মহর্ষির "কর্ম্মজীবন"-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে রচিত হইলেও, প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠে কাহারও কোন উপকার দর্শিলে আমাদিগের শ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

পরিশেষে নিবেদন এই যে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণকালে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় পারদর্শী ও গুণজ্ঞ শ্রীযুক্ত ছত্রধর ঘোষ মহাশয় দয়া ও উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক ইহার প্রুফশীট দেখিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংশোধনাদি কার্য্যেও বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ।
১৯৷৩ ছকুখানসামার লেন, (মৃজাপুর ষ্ট্রীট), কলিকাতা।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"ধরম-একতাক্ষেত্রে শান্তিসুখতরে
দাতা হন স্বয়ং ব্রহ্ম থাকি হৃদি'পরে।"

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষয়		পৃষ্ঠা
কর্ম্মজীবন তত্ত্ববর্ণন।	...	১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তীব্র বৈরাগ্য ও পরিব্রজন। ... ৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রীতি কামনায় নিষ্কাম কর্ম্মসাধন। ... ৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐশী শক্তির প্রেরণা ও আশ্চর্য্য ঘটনারাজী;
এককোটি টাকা পিতৃঋণ পরিশোধ। ... ১৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণ।

স্বদেশ ও বিদেশ পর্য্যটন, অদম্য ভ্রমণ-স্পৃহা সম্বন্ধে
কথন, কর্ম্মজীবনে মহৎ আদর্শ প্রদর্শন। ... ৩৩

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ (বঙ্গদেশ) পর্য্যটন। ... ৪০

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঐ ... ৪৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পর্য্যটন। ... ৬১

নবম পরিচ্ছেদ।

যমুনা প্রদেশে ভ্রমণ ও মথুরা বৃন্দাবনের দৃশ্যবর্ণন। ... ৬৯

দশম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমণ ও অমৃতসরের দৃশ্য বর্ণন। ... ৭২

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সিমলা ও পার্ব্বতীয় দেশ ভ্রমণ। ... ৮০

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সিমলায় সিপাই বিদ্রোহ ও মহাভীতি উৎপাদক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মহর্ষির অশেষ ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সৎসাহস। ... ৮৪

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গম পার্ব্বতীয় দেশে ভ্রমণ ও সিমলাতে প্রত্যাবর্ত্তন, কিয়দ্দিন পরে পুনরায় প্রকৃতিতে ব্রহ্ম দর্শনার্থে উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ এবং অতীব কৃচ্ছ্র সাধন। ... ৯১

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উচ্চগিরি আরোহণ, নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নানাবর্ণের প্রস্ফুটিত সুগন্ধময় পুষ্প দর্শনে পরমানন্দ উপভোগ। ... ১০০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সিমলা শৈলে প্রত্যাবর্ত্তন, পার্ব্বতীয় দেশে ভ্রমণকালে শীত ও উষ্ণ সহন। ভৃত্যের প্রতি আশ্চর্য্য ক্ষমা প্রদর্শন। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের অতি উচ্চ শিক্ষা লাভে পরমাত্মার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ... ১০৭

বিষয় পৃষ্ঠা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতীয় রাজা ভজ্জীর রাণার নিমন্ত্রণ রক্ষা। তান্ত্রিক ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ ও অস্বীকার। রাজকুমারের সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণ। সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন। ... ১১২

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।

সিমলা পাহাড়ে বাসকালে নিকটস্থ বন উপবনে ভ্রমণ। একদা নদীতীরে পর্য্যটনে আশ্চর্য্য দৃশ্যদর্শন ও স্বদেশে প্রত্যাগমন সম্বন্ধেও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-বাণী প্রাণাভ্যন্তরে শ্রবণ ও সিমলা-শৈলত্যাগ। ... ১১৬

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সিমলা হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনকালীন সিপাই বিদ্রোহ হেতু পথে ভয়াবহ দৃশ্য ও ঘটনাবলী। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিজ্ঞতার সহিত বিপদ হইতে উদ্ধার ও কর্ত্তব্য সাধন। ... ১২১

বিষয় পৃষ্ঠা

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবার কালে সিপাই বিদ্রোহ হেতু নানা বিঘ্ন-প্রতিবন্ধক ও তাহার প্রতীকার। ... ১২৩

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদ হইতে ষ্টীমারযোগে কলিকাতা গমন-কালে বহু বিঘ্ন হইতে উত্তরণ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে চলিতে চলিতে জাহাজের খোলে পতিত হইতে হইতে আশ্চর্য্যভাবে আত্মরক্ষা। ... ১৩১

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামপুর বোয়ালিয়া পঁহুছিয়া পুনরায় ষ্টীমার সম্বন্ধে কষ্ট উপস্থিত, ষ্টীমার পরিবর্ত্তন। পরে কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছন। ... ১৩৫

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় বিবিধ মহৎ কার্য্যের সংসাধনে উদ্যম ও উৎসাহ প্রদর্শন এবং দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্ম-প্রচার। ... [illegible]

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গে নানা শুভ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার অবস্থায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সমাচার অবগত হইয়া সাহায্য দানার্থে দেশের লোকের প্রতি চিত্ত-বিমোহন উপদেশ প্রদান ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। ... ১৪২

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবদাদিষ্ট ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনে তৎপর থাকিয়া স্বদেশে বিদেশে এবং সমুদ্রপথে ভ্রমণাদির মনোহর ও ভয়ঙ্কর বিবরণ বর্ণন। ... ১৪৯

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহানুষ্ঠান কার্য্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পরিচালন-শক্তির সুন্দর পরিচয়। ... ১৫৩

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

তত্ত্ববোধিনী-সভা-স্থাপন-বৃত্তান্ত। ... ১৫৮

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বোলপুর-শান্তি-নিকেতন-বৃত্তান্ত। ... ১৬১

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দয়া ও দাতব্য।

পরার্থ-পরতা, উদারতা ও দাতব্য ইত্যাদি
পুণ্যময় কার্য্যের সমাবেশে হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। ... ১৬৯

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদারি কার্য্য।

বিষয় জ্ঞানে প্রবীণতা ও জমিদারি কার্য্যে
নিপুণতা। ... ১৭৭

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গার্হস্থ্য জীবন।

অশেষ সহিষ্ণুতা, উদারতা, ক্ষমা এবং আত্মীয়
স্বজনগণের প্রতি গভীর প্রেমের ব্যবহার। ... ১৯১

বিষয় পৃষ্ঠা

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেশ হিতৈষিতা।

দেশের মঙ্গল জন্য আন্তরিক হিতচেষ্টা ; নিষ্কাম ভাবে স্বদেশের উপকারের জন্য বিশেষ যত্ন ও অর্থব্যয় ; আড়ম্বরশূন্য দান। ... ২০৪

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষাবস্থা ও তিরোধান।

ধর্ম্মের সাক্ষী কর্ম্ম ও কর্ম্মের সাক্ষী মৃত্যু। ... ২১৫

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম্ম-জীবন।



প্রথম পরিচ্ছেদ।



কর্ম্মজীবন তত্ত্ববর্ণন।

কর্ম্মজীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন কর্ম্মযোগী ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্ম্মীদিগের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তিনিই বলিতেন "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ এবং বিষয়কর্ম্মক্ষেত্রে একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি"। যেখানে বড় বড় বিষয়ী ও কর্ম্মীদিগের বুদ্ধি খাটিত না, সেখানে তিনি সহজ ও সরল ভাবে

এমন সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়া বলিয়া দিতেন যে, সকলেই তাহা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার সেরূপ কর্ম্মবিশেষের বৃত্তান্ত সহ তালিকা প্রকাশ করা এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা অগ্রে তাঁহার তত্ত্বজীবনের কথা বলিতেই প্রবৃত্ত। প্রবল প্রবাহিণী গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তীরবর্ত্তী দেশসমূহের উর্ব্বরতা এবং উর্ব্বরা ভূমিতে শস্য, ফল, মূল এবং জনগণের সুখ স্বচ্ছন্দ আনন্দ-ধারা দেখিয়া তত্ত্বপিপাসু মানবাত্মা চলিল-কোথা? না—গঙ্গোত্রিতে—গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান দর্শন করিতে। আমরা তাই দেবেন্দ্র-জীবনরূপ গঙ্গায় আমাদের অপবিত্র জীবনকে শুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার আত্মজ্ঞান এবং আত্মতত্ত্বরূপ মহাদেশে যাত্রা করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের উৎপত্তিস্থান দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়াছি, তাহা এক অনন্ত ব্যাপার। আমরা যখন তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতাম তখন সেই সুগঠিত দেব-তনু, সেই উদ্যমপূর্ণ এবং অনন্ত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত তাঁহার

সেই আত্মাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতাম। আজ তিনি অমরধামে, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার কোনও সুযোগ নাই; দেহযোগে তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণ করিবার আর যো নাই; কিন্তু মনন চিন্তন তো বন্ধ হইবার নহে, তাই আমরা তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যাহা চিন্তাক্ষেত্রে ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইতেছি, লেখনীযোগে তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিব।

যদি জীবনক্ষেত্রে পরীক্ষাজনিত দুঃখ ও ক্লেশ-রাশির প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই উভয় মহাত্মার জীবনে তাহার তারতম্য অবধারণ করা সহজ কার্য্য নহে। যদি পরীক্ষাসম্ভূত দুঃখ কষ্ট ক্লেশের বেদনার কোনও পরিমাণ থাকে, তবে আমরা বলি উহাতে সে পরিমাণটা ছিল না বলিলেই হয়। এই উভয় মহাজন যে সকল পরীক্ষায় পতিত হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিতে গেলে লোমাঞ্চ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপ ঘোর

পরীক্ষার মধ্যেই ব্রহ্মবললাভে অধিকারী হইয়া ছিলেন। এই ভবে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ যে বিনা পরীক্ষায় অথবা কেবলমাত্র সুখ স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে থাকিয়া ব্রহ্মবল লাভ করিয়াছেন, এমন কোথাও দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মবললাভের মূল্যই পরীক্ষাদান ও তজ্জনিত ক্লেশ ও যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করা। এ সম্বন্ধে Saint Francis de Sale of Geneva কি চমৎকার কথাই বলিয়াছেন, যথা :—

"Raise your eyes to Heaven, and among the mortals now immortal there you will not find one who attained Eternal happiness, but through continual afflictions and troubles.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তীব্র বৈরাগ্য ও পরিব্রজন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশে দেশে, নদ নদীতে পাহাড়ে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া মহাপরিব্রাজ্যে যে তত্ত্বরত্ন আহরণ করিয়া জীবনে এবং গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করতঃ তাহা ভারতের ভাবী বংশধরদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দুঃখিনী ভারতমাতার অনেক দুঃখের যে অবসান হইবে, ইহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ধর্ম্মজীবন বাদ দিয়া প্রকৃত কর্ম্মজীবন লাভ হয় না। এবং কর্ম্মজীবনকে ত্যাগ বা অবহেলা করিয়া ধর্ম্মজীবন সংগঠন করিতে গেলে তাহাতে বিশ্ববিধাতার অভিপ্রেত ধর্ম্মজীবন সংগঠিত না হইয়া মানবের স্বেচ্ছাগত একটি ধর্ম্ম-গোলকধাঁধা প্রস্তুত হয় মাত্র; সে গোলকধাঁধায় কর্ম্মদ্বেষী ধর্ম্মী তাহার চেলাদের সহিত আজীবন ঘুরিতে থাকে। ভারতে এই প্রকার ধর্ম্ম-বিকৃতিরূপ

গোলাকধাঁধার মধ্যে এক্ষণে কত লক্ষ লক্ষ সাধু ও ধার্ম্মিক নাম ধারী লোক ভ্রমণ করিতেছে এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্ম যে ব্রহ্মপূজা, তদ্দারা তাহার কি ভয়ানক অপলাপই হইতেছে! এরূপ অন্ধকারময় সময়ে—অমানিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া যিনি উঠিলেন, তিনি ত নিজের কথায় নহে—কোনরূপ চিত্তের আবেগে নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিদের কথায় —বেদান্তের কথায় বলিয়া উঠিলেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্রপদার্থে সুখ নাই। উপনিষদের এই শ্লোকের ভাবার্থ তাঁহাকে এমন মহাভাবে উপনীত করিয়াছিল যে তিনি তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যার অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

যুবা দেবেন্দ্রনাথ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইলেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রের বহুবিধ কষ্ট যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করতঃ আবার ভগবানের বিভূতিবৈভবরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে গেলে

প্রতীতি হইবে যে, তিনি প্রাচীন আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রের রাজা "হরিশ্চন্দ্র", ইহুদি-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশ্বাসী "জোব" এবং ইসলাম-ধর্ম্মশাস্ত্রের মহাত্যাগী "হাতিমতাই" সদৃশ মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় আবার ব্রহ্মকৃপাবলে স্বয়ং তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকিয়া তাঁহারই ঐশ্বর্য্য রাজর্ষির ন্যায় অধিকারে ও ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র যথা, সর্ব্বস্ব সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের পদে অর্পণ করিয়া সত্য রক্ষা করিতে তৎপর ছিলেন বলিয়া যখন সে সম্বন্ধে ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল তখন অম্লান বদনে তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেই পরীক্ষানলে ঝাঁপ দিলেন। হৃদিস্থিত হরি তাঁহাকে পরীক্ষা হইতে যথা সময়ে উত্তীর্ণ করিলেন ও স্বপদে স্থিত করিলেন। মহাত্মা জোব রাজা সম্বন্ধে ও তাই। ঈশ্বরবিশ্বাস হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ কত না চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ক্রমে সকলেই পরাস্ত হইল। পরে জোবের ধর্ম্মবিশ্বাস জয়লাভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রীতি কামনায় নিষ্কাম কর্ম্মসাধন।

ঈশ্বর-প্রীতি কামনায় কর্ম্মক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতদূর সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার সহবাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন। তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মজীবন-তত্ত্ব আমরা যত কেন প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করি না, তাহা বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাগুণে বঙ্গবাসিদিগের কর্ণে কেমন কেমন যেন শাস্ত্রের মন্ত্র আবর্ত্তন করার মত বা শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়ানর মত অনুভূত হইবে। এ জন্য সে দিকে এক্ষণে ততটা না গিয়া আমরা কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে এ যুগের কর্ম্মপ্রধান জাতির মধ্য হইতে মহা-কর্ম্ম-তত্ত্ববিদ্ হেন্‌রি ড্রমণ্ড (Henry Drummond) সাহেবের কর্ম্ম-তত্ত্বদর্শন (শাস্ত্রবৎ) অবলম্বনে কতকটা বুঝাইতে

চেষ্টা করিতেছি। ইহা দ্বারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবন সমন্ধে প্রকৃত-তত্ত্ব-নিরূপণ বিষয়ে পাঠক-গণ অনেকটা অবধারণ করিতে পারিবেন। হেন্‌রি ড্রমণ্ড মহাশয় তাঁহার Ideal life (প্রকৃত জীবন) নামক পুস্তকের এক স্থানে মানবের কর্ম্ম-জীবন কিরূপ হওয়া চাই, সেই সম্বন্ধে যে সার সার কথা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

THE WORKING LIFE.—

To most men, work is just work—manual work, professional work, office work, household work, public work, intellectual work. A yellew primrose is just a yellowprimrose; a spade is a spade; a ledger is a ledger; a lexicon is a lexicon. To a worker with this mind, so far as spiritual uses are concerned, therefore work is vanity—an unaccountable squandering of precious time. He must earn his success by the sweat of his brow; that is all he knows about it. It is a curse, lying from the begining upon man as man. So six days each week he bends his

neck to it doggedly ; the seventh God allows him to think about the unseen and eternal.

Now God would never unspiritualise three-fourths of man's active life by work, and if work were work nothing more.

A second workman sees a little further. His work is not a curse exactly ; it is his appointed life, his destiny. It is God's will for him, and he must go through with it. No doubt its trials are good for him ; at all events, God has appointed him this sphere, and he must accept it with Christian resignation.

It is a poor compliment to the Divine arrangements if they are simply to be acquiesced in. The all-wise God surely intends some higher outcome from three-fourths of life than bread and butter and resignation.

To the spiritual man, next, there lies behind this temporal a something which explains all. He sees more to come out of it than the year's income or the employment of his allotted time or the benefiting of his species. If violins were to be the only product,

there is no reason why Stradivarius should spend his life in making them. But work is an incarnation of the unseen. In this loom man's soul is made. There is a subtle machinery behind it all, working while he is working, making or unmaking the unseen in him. Integrity, thoroughness, honesty, accuracy conscientousness, faithfulness, patience—these unseen things which complete a soul are woven into it in work. Apart from work, these things are not. As the conductor leads into our nerves the invisible electric force, so work conducts into our spirit all high forces of character, all essential qualities of life, truth in the inward parts. Ledgers and lexicons, business letters, domestic duties, striking of bargains, writing of examinations, handling of tools—these are the conductors of the eternal. * * * No man dreams integrity, accuracy, and so on. He cannot learn them by reading about them. These things require their wire as much as electricity. The spiritual fluids and the electric fluids are under the same

law ; and messages of grace come along the lines of honest work to the soul like the invisible message along the telegraph wires. Patience, spiritually, will travel along a conductor as really as electricity.

A workshop, therefore, or an office, or a school of learning, is a gigantic conductor. An office is not a place for making money it is a place for making character. A workshop is not a place for making machinery—it is a place for making men ; not for turning wood, for fitting eagines, for founding cylinders to God's eye, it is a place for founding character ; it is a place for fitting in the virtues to one's life, for turning out honest, modest tempered, God-fearing men. A school of learning is not so much a place for making scholars; as a place for making souls. And he who would ripen and perfect the eternal element in his being will do this by attending to the religious uses of his daily task, recognising the unseen in its seen, and so turning three-fourths of each day's life into an everacting means of grace."

ঐরূপ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানসহকারে সাধু-পুরুষদিগের আভ্যন্তরিক ও অভ্যস্ত কর্ম্ম-জীবন জগতে আদর্শ রূপে কত না উপকার সাধন করিয়া থাকে। রাজ-সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মী ও কর্ম্মী বা রাজর্ষি, তাঁহারা সেইরূপ জীবন ধারণ করিয়া স্বকর্ত্তব্য সুনির্ব্বাহ পূর্ব্বক ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ পরলোকে ব্রহ্মকৃপাবলে অনন্ত আনন্দ উপ-ভোগ করিতে থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ কর্ম্মজীবনের এইরূপ আদর্শ সন্থ সন্থ তাঁহার জীবদ্দশায় নিরীক্ষণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐশী শক্তির প্রেরণায় ও আশ্চর্য্য ঘটনারাজী ; এককোটী টাকা পিতৃঋণ পরিশোধ।

সচরাচর সংসারে বিষয়ী লোক যেমন স্বীয় স্বীয় গুণ বা প্রতিভানুসারে বিষয়কর্ম্মে রত হইয়া বিত্তভোগের প্রয়াসী হয়েন, সেভাবে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে বলিয়াছিলেন ঃ—"অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" অর্থাৎ বিত্তেতে অমৃতত্বের আশা নাই। এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান উক্ত মহাত্মা যৌবনকাল হইতেই লাভ করিয়া বিষয়বিরাগ ও ব্রহ্মসাধনে অনুরাগ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনী পাঠে তাহা বিশদভাবে অবগত হওয়া যায়। যাহা কিছু নশ্বর, যাহা কিছু ক্ষণিক বলিয়া জানিতেন, তাহাতে উপেক্ষা ও যাহা তিনি সেশ্বর বলিয়া প্রতীতি করিতেন তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন

করিতেন। বাস্তবিক তিনি যুবাবস্থাতেই সত্যানুসন্ধান ও ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় একান্ত প্রয়াসী ছিলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটি পাতা তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। ঔৎসুক্য বশতঃ তাহা ধরিলেন, কিন্তু তাহাতে কি লেখা আছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন মনে করিলেন, কে ইহা পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন; এই ক্ষেত্রে তিনি ব্যাকুল অন্তঃকরণে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে বর্ণিত আছে। ঐ সংস্কৃত পুস্তকের পাতাটিতে উপনিষদের যে শ্লোক মুদ্রিত ছিল তাহা এই ঃ—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"
(ঈশোপনিষৎ)

ইহার অর্থ এই যে "এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপচিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও

না।” এই শ্লোকটীর মর্ম্ম কথা হইতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কি ধর্ম্মজীবনে কি কর্ম্মজীবনে দৈব শক্তিসঞ্চার এবং জীবনের গতি পথ মুক্তভাবে খুলিয়া গিয়াছিল। এই শ্লোকার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি এক নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভগবৎ সেবা লক্ষ্যে ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনে যেমন রত ছিলেন, তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রের বিবিধ বা বিস্তারিত বিষয়কার্য্য সম্পাদনেও উদ্যমশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ম্মসাধন শক্তি এতদূর উন্নতাকার ধারণ করিয়াছিল যে, তাহাতেই তিনি তাঁহার পিতৃদেবের পরলোক গমনের পর বহু বহু বিঘ্নের মধ্যে পতিত হইয়াও তাহা হইতে উদ্ধার হওত স্বপদস্থ থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে তদ্বিষয়ের বিবরণ পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার পিতৃঋণ প্রায় এক কোটি টাকা তিনি অসাধারণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন। সে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। এ সম্বন্ধে তিনি

তাঁহার আত্মজীবনীতে যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস "কার-ঠাকুর কোম্পানি" টলমল করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কতদিন চলে। এই সময়ে একদিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল। সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানির হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল—আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল। ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। প্রধান কর্ম্মচারী ডি, এম, গর্ডন সাহেবের পরামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয়তলস্থ গৃহে উহাঁরা সকলে সমবেত হইলেন। ডি, এম, গর্ডন আমাদের দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত করিলেন। সেই হিসাবে দেখান হইল যে, আমাদের

হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা—পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে "হাউসের অধিকারীরা আপনার আপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং ইহাঁদের জমীদারীর স্বত্ব, সকলি আপনাদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন; কিন্তু একটী ট্রষ্ট-সম্পত্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না"। গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রষ্ট সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রষ্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাহাতে আমরা পিতৃঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রষ্ট সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে। এদিকে পাওনাদারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপর

তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। এইরূপে যখন তাঁহারা অনতিবিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে ট্রষ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষণ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, এই হাউসের উত্থান ও পতনে আমাদের কোনও হস্ত নাই। আমরা নির্দ্দোষ ও নিরীহ। আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এই ঐশ্বর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই আমাদের থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, না, তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোথা হইতে দয়া আইল? তিনিই ইহাঁদের মনে দয়া প্রেরণ করিলেন, যিনি আমার চিরজীবন সখা। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন ইহাঁরা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইহাঁদের সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণের জন্য ইহাঁরা প্রতি বৎসর

২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদারদিগের মধ্যে এইরূপে একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন আপনার পাওনার জন্য আদালতে নালিশ আনিলেন না। আমাদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার অধীনে আরও কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে কার-ঠাকুর কোম্পানি "ইন্‌লিকুইডেশন" নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল।

আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারেরা আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—"আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম"। তিনি বলিলেন—হাঁ, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা আর কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক যে ইহাঁরা সকল ধন দিলেন, "সর্ব্ববেদসং দদৌ"। আমি বলিলাম যে, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালতে তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া

বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটী চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম। এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না! ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইন্‌সল্‌বেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়। এই সকল কথাবার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁহুছিলাম।

আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই তেমনি বিষয়ও নাই, বেস মিলে গেল—

হাফেজের উক্তি—

"সেই অভিলাষে, বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক—যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধন ধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে।" বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি যে, "হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন।

গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। তুমড়ীকি ঠড়্ডিয়া ময়েসসর নহীকে চিবাকে পানি পিয়ুঁ।” যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই একদিন, আর অদ্যকার এই এক দিন। আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম—খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম—ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার আর ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। “হে ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।”

হাউস পতনের তিন চারি মাস পরে গিরীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলিলেন যে “এত দিন চলিয়া গেল কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা

বসিয়া মাহিনা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। অতএব আ' পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যয়ে অনতিদীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি।" আমি বলিলাম যে, এ তো বড় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। পরে আমরা পাওনাদার-দিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। তাঁহারা আহ্লাদপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন।

যিনি ঈশ্বরের পথে থাকিয়া তাঁহার আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া অগ্রসর হয়েন এবং সময়ে সময়ে জীবনে তাঁহার সঙ্কেত বুঝিয়া নির্ভয়ে কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার আত্মজ্যোতিই কি ধর্ম্ম কি কর্ম্ম উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার পরিচালক হইয়া তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যায়। তাই ব্রহ্মপ্রাণ ব্রহ্মপন্থীর যাত্রাপথে যত কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হয়, একে একে সব কাটিয়া যায়। এই ক্ষেত্রেই আত্মজ্ঞানে মহা

জ্ঞানী Saint Francis de Sales (সাধু ফ্রান্সিস) মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

"God knows what we are, and will hold out his paternal hand to us in a difficult step, in order that nothing may arrest us."

অর্থাৎ "আমরা কি তাহা ঈশ্বর জানেন এবং তিনি তাঁহার পিতৃহস্ত প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে বিপদে রক্ষা করিবেন—যাহাতে কিছুতেই আমা-দিগকে আবদ্ধ করিতে না পারে।"

উক্ত সাধু মহাত্মা আরও বলিয়াছেন ঃ—

"Do not think of what may happen you to-morrow, for the same eternal. Father who cares for you to-day will care for you to-morrow and always ; either He will not send you trouble, or, if He does, He will give you invincible courage to bear it."

অর্থাৎ "কল্য কি ঘটিবে তজ্জন্য ভাবিও না, কেননা সেই অনন্তদেব পরম পিতা—যিনি অদ্য তোমায় যত্নে পালন করিতেছেন, তিনি কল্যও

তাহা করিরেন। চাই, কি, তিনি তোমার জন্য কষ্ট নাও প্রেরণ করিতে পারেন। আর যদি তাহা প্রেরণ করেন, তিনি তোমাকে এরূপ দুর্ভেদ্য সাহস দিবেন—যদ্দ্বারা তুমি তাহা বহন করিতে পারিবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিপদের উপর বিপদ আসিয়া যেমন উপস্থিত হইত, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস, সৎসাহস ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরের ভাবও তেমনি বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার আত্মাকে আরও উন্নত সোপানে লইয়া যাইত। বর্ত্তিকার শলাকা যখন জ্বলিতে থাকে তখন তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া দিলে তাহা যেমন আরও প্রজ্বলিত হয় সাধু মহাত্মাদিগের জীবনরূপ বর্ত্তিকার আলোকযুক্ত শলাকা পরীক্ষারূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদিত হইলে আলোকের শিখা তেমনি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নিম্নে তাঁহার আত্মজীবনীর উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ তাহা সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে পারিবেন।

"১৭৭৬ শকে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি হাউসের কার্য্য যে প্রকার নিপুণতার সহিত চালাইতেছিলেন,

তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সে কার্য্য চালাইবার একটা বড়ই অভাব পড়িয়া গেল। এতদিনে অনেক ঋণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও রহিয়াছে। কোন কোন পাওনা-দারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের নামে নালিশও করিয়াছে এবং ডিক্রীও পাইয়াছে। আমি এই সময়ে প্রতিদিন মধ্যাহ্নের পর তত্ত্ব-বোধিনী সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের দোতালায় সভার কার্য্যালয়েই থাকিতাম। একদিন আমি আহারের পর সভায় যাইতেছি, এমন সময় আমার বাড়ীর লোকেরা বলিল যে, "আজ একটা ওয়ারিণের আশঙ্কা আছে।" মিথ্যা একটা বাধা মাত্র মনে করিয়া আমি শুনিয়াও সভাতে চলিয়া গেলাম এবং সেখানে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি যে, একজন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া চোক মুখ লাল করিয়া আমাকে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—"আমি যে আজ আপনাকে এখানে আসিতে মানা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আপনি আজ এখানে কেন এলেন?" পরে সে বেলিফকে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ইনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" তখন সেই বেলিফ আমাকে একখানা ওয়ারেন্ট দিল। বলিল "১৪০০০৲ চৌদ্দ হাজার টাকা এখনি দেও।"

আমি বলিলাম, চৌদ্দ হাজার টাকা এখন আমার কাছে নাই। সে বলিল "তবে এখন আমার সঙ্গে সেরিফের নিকট এস।" আমি তাহাকে একটু বসিতে বলিয়া গাড়ী আনিতে পাঠাইলাম। গাড়ী আসিল এবং সেই সাহেব বেলিফ সেই গাড়ীতে করিয়া আমাকে সেরিফের নিকট লইয়া গেল। এদিকে আমাদের বাড়ীতে মহা গোল উঠিয়াছে—আমাকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সকলেই আমাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে বারণ করিয়াছিল, আমি কাহারও কথা শুনি নাই, আমাকে ওয়ারেণ্ট ধরিয়াছে; সকলেরই মুখে এই কথা। আমাদের উকিল জজ সাহেবই ঘটনাক্রমে সেই বৎসরে সেরিফ ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার আপিসে বসাইলেন এবং আমি যে কেন আজ বাহির হইয়াছিলাম তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ জজ কলবিনের নিকট গিয়া উপস্থিত। তিনি জামিন দিয়া আমাকে খালাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন আমাদের বাড়ীর চন্দ্রবাবু প্রভৃতি জামিন হইয়া আমাকে কারাবাসের দায় হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন। আমার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না,

কিছুই বলে না, আমাকে জানাইলে তো আমি তার ঋণের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।" আমি ইহা শুনিয়া তাহার পরদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "দেখ, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা পরিশোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।" আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কাছে আমি প্রায়ই প্রতিদিন যাইতাম। তাঁহাকে হিসাব পত্র দেখাইতাম এবং দেনা পাওনার কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিতাম।"

জটিল বিষয় কর্ম্মের ভার বহন করিতে করিতে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির মীমাংসা করিতে ও উত্তর দিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না; বরং আশ্চর্য্য আত্মিক বল ও প্রত্যুৎপন্নমতি সহকারে

তাহা সম্পন্ন করিতেন। তিনি নীরসভাবে তাহা কখনই করিতেন না। সরল, সরস, প্রফুল্ল ভাবই তাঁহার আত্মাকে মধুময় করিয়া রাখিত। "ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" উপনিষদের এই মহাবাক্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে বড়ই সুন্দররূপে প্রতি-ফলিত হইয়াছিল। তিনি যেমন সৎবক্তা অথচ উচিতবক্তা ছিলেন তেমনি মধুরভাষী ছিলেন। তিনি যখন তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট তাঁহার পরামর্শানুসারে জমিদারীর আয়ের টাকা হিসাবপত্র দেখাইতে যাইতেন সেই সময় দুইটী দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, একটী হাস্যজনক, অপরটী গভীর আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয়। মহর্ষির আত্মজীবনীর অষ্টাবিংশ পরিচ্ছদের শেষাংশে এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ—

"সেই সময়ে যখনই আমি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটী যাইতাম, দেখিতাম তাঁহার একপ্রান্তে শাদা একটী মোড়াঁশা পাকড়ী পরিয়া তাঁহার প্রিয় মোসাহেব নব বাঁড়ুয্যা নিয়তই রহিয়াছে। যেমন জজের কোর্টে শেরিফ,

সেইরূপ ইঁহার দরবারে নব বাঁড়ুয্যা। নব বাঁড়ুয্যার সহিত তাঁহার সকল বিষয়েরই পরামর্শ হইত। নব বাঁড়ুয্যা কেবল তাঁহার একমাত্র বিশ্বাস-পাত্র ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সাক্ষাতে এই নব বাঁড়ুয্যা একদিন আমাকে বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর লাইব্রেরীতে বসিয়া ইহা পড়ি; ইহা পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়"। আমি বলিলাম, তুমি কি তত্ত্ব-বোধিনী পড়? প'ড়ো না, প'ড়ো না। প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন কেন? তত্ত্ববোধিনী পড়িলে কি হয়? আমি বলিলাম, তত্ত্ববোধিনী পড়িলে আমার যে দশা, তাই হয়। তিনি বলিলেন, "আরে দেবেন্দ্র কোব্‌লো জবাব দিলো—একাবারে যে কোব্‌লো জবাব দিলো"। এই বলিয়া তিনি বড়ই হাসিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন —"আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি? আমি বলিলাম ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে, আপনি আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আরে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি?" আমি বলিলাম, ঈশ্বর যে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি? তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর আর দেওয়াল বুঝি

সমান হইল? হাঃ, দেবেন্দ্র বলে কি?" আমি বলিলাম যে, এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু— তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন।"

ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহা উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। সে উৎসাহ—সে জাগ্রতভাব দেখিলে মনে হইত তাহাই যেন তাঁহার জীবনের উৎস—তাঁহার প্রাণের বস্তু। ফলে ধর্ম্ম লইয়া কথা কহিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন।

বিষয়কর্ম্মের চর্চ্চার মধ্যেও নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের কথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কত যে সুচারুরূপে বলিতে পারিতেন, তাহা শ্রবণে শ্রোতারা বড়ই প্রীত হইত এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিত। তাঁহার ধর্ম্মভাব কর্ম্মসাধনে এবং কর্ম্মাভ্যাস ধর্ম্মসাধনে সহজেই পরিণত হইত। এই উভয়কেই তিনি ঈশ্বরের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন বলিয়া এরূপ আত্মস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মসাধন ধর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া প্রতীয়-মান হইত।

বহু বহু বিপন্নাবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ম্রিয়মাণ হইতেন না। একদিকে বিষম দায়গ্রস্ত বিষয় বিত্ত সম্বন্ধীয় কর্ম্মের ঝনঝাট্ সহ্য করিয়া চলিতেন, আর দিকে কর্ম্ম সাধন, কর্ম্মানুষ্ঠান ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার কার্য্য নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। এই সকল গুরুতর কর্ম্ম-জনিত বহুশ্রম—বহুক্লেশ ভার তাঁহার শিরোপরি অম্লানবদনে বহন করিতেন। সে সমস্ত কেবল মাত্র গভীর ভগবৎ প্রেমের বলে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন। *

* এইরূপ কঠিন দুঃখ-ক্লেশ ও পরীক্ষার অবস্থায় "নেয়াজ" নামক একজন ভগবৎ প্রেমে গভীর প্রেমিক মহাত্যাগী পুরুষ গাহিয়াছিলেন :— (গজল)

"ইস্‌কে মে তেরে কোহে গম্ শির'পর লিয়া যো সো হো !
এয়োশো নেশাৎ জিন্‌দিগি ছোড়্ দিয়া যো হো সো হো !"

(ঐ গজলের অর্থ গজলের সুরে)

তব প্রেমের তরে শির পরে দুঃখ-গিরি করেছি ধারণ,—যাহবার তা হোক এখন ! (১)

(মোর) এমন যে আয়েশের জীবন করেছি হে বিসর্জ্জন—যাহবার তা হোক এখন !" (২)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণ।

স্বদেশ ও বিদেশ পর্য্যটন, অদম্য ভ্রমণ-স্পৃহা
সম্বন্ধে কথন, ও কর্ম্ম জীবনে
মহৎ আদর্শ প্রদর্শণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশ ও বিদেশভ্রমণ বৃত্তান্ত যেমন দীর্ঘ তেমনি সারগর্ভ সমাচার পূর্ণ। তিনি প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মদর্শন ও ধর্ম্ম সাধন করিয়া মুক্তির পথ অবলম্বন করিবেন বলিয়া তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পারিব্রজন স্পৃহা বড়ই প্রবল হইয়াছিল। তাহা অনুশীলনে ধর্ম্মভাব ও কর্ম্ম প্রভাব আপনা আপনি পাঠকের হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আত্মাকে পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন করে। এই দিব্য অবস্থা স্বভাবের নিয়মে প্রাণে অনেকে অনুভব করিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা

৩

ও দীক্ষা লাভে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ও অনুরাগী হইয়াছিলেন। এই অনুরাগে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের আস্বাদ পাইয়া কেহ কেহ ব্রহ্মকৃপায় ও মহর্ষির আদর্শানুসারে জীবনের উদ্দেশ্য যে কি তাহা প্রকৃতপক্ষে বোধগম্য করিয়া স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ এই ত্রিবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বজ্ঞান লাভে অধিকারী হওত স্বীয় পরিজন, প্রতিবাসী ও জন সাধারণের হিত সাধনে চির কল্যাণ বিধায়ক উন্নতির সোপান বা অনন্তের পথ নিরীক্ষণ করত ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিলেন। সংসারগতি তাহাদিগকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলনা; বরং দিন দিন উন্নতি হইতে উন্নতির পথে আরূঢ় হইয়া তাহারা ভগবৎ ভক্তি ও মানব মণ্ডলীর সেবাতে তাহাদিগের জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব সম্ভূত এক নব যুগের অভ্যুদয় হইল।

ভারতবাসীর পক্ষে স্বদেশ ও বিদেশ পর্য্যটনের পথ একালে প্রথমে স্বর্গগত মহাত্মা রামমোহন রায়

প্রদর্শন করিয়া যান। তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় ভারতবাসীদিগের মধ্য হইতে শত সহস্র যাত্রী সেই পথে চলিয়াছে। মহর্ষি ও তাঁহার গুণবান ও পুণ্যশীল শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ঐ পথের পথিক হইয়া সেই যাত্রীদিগের পথ কতনা সুগম করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাঁহারা অশেষ শ্রম, যত্ন, ও অধ্যবসায় সহকারে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ শুভ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে সেই সমস্ত সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিদিগের আরাধিত সনাতন ব্রহ্ম তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে তাঁহাদের সেই লক্ষ্য অটল থাকিত বলিয়া তাঁহারা জন সাধারণের হিতসাধনের জন্য কত না শাস্ত্র সঙ্কলন ও উপায় নিদ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া ভারতের হিতার্থে তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনে বহুবিধ শুভ

কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভ্রমণ প্রিয় হইয়া বহু দেশে প্রকৃতির নানা দৃশ্যের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শনে আত্মিক উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবল ভ্রমণ স্পৃহার উৎপত্তি কোথা হইতে? ব্রহ্ম লক্ষ্য হেতু তাঁহার ব্যাকুলতা হইতে। এক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে গেলে তাঁহার আত্মত্যাগ ও গভীর আত্মজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার বিবরণ আমরা নিজের দুর্ব্বল লেখনীদ্বারা ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার আত্ম জীবনীতে যেরূপ সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত আছে তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলোম।

"এখন আমি আত্মার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। আত্মার মূল তত্ত্ব কি, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্রোতে যে সকল সত্য ঈশ্বরের প্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগূঢ় অর্থ সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্নবান্ হইলাম।

(হাফিজের উক্তি)

'প্রকাশ হলো না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম। দুঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া র'য়েছি'। কোথায় ছিলাম কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকট প্রকাশ হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না; আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আমাকে উপদেশ দিতেছেন, "কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ। তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ।" কার তুমি এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভ্রাত, এই তত্ত্বটি চিন্তা কর। এই সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে আমি বরাহ নগরে শ্রীযুক্ত গোপাল লাল ঠাকুরের বাগানে ছিলাম। এখানে শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়িতাম। পড়িতে পড়িতে তাহার এই শ্লোকটা আমার মনে লাগিয়া গেল—"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং।" হে সুব্রত!

জীবদিগের যে রোগ যে দ্রব্য দ্বারা জন্মে, সে দ্রব্য কখনো রোগীকে আরাম করিতে পারে না। আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ ঘোরে পড়িয়াছি, অতএব এসংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পলাও। সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত বড়ই শান্তি দিত। মনে করিতাম ইহারা কেমন কামচার। কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাই-তেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিলাম "যইহাত্মা নমনুবিত্ত ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" যাহারা এখানে এখন আত্মাকে জানিয়া এবং এই সত্য কামনাকে জানিয়া পরিব্রজন করে, তাহারা পরকালে সকল লোকেই কাম-চার হয়, সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করিতে পারে। এইটি আমার বড়ই লোভনীয় হইল। ভাবিলাম আমি এখান হইতে গিয়া সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইব।

আবার যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে দেখিলাম "ন ধনেন ন প্রজয়া নকর্ম্মনা ত্যাগেনৈ কনামৃতত্ব মানশুঃ"। না ধনের দ্বারা না পুত্রের দ্বারা না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃত্বকে ভোগ করা যায়। তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলি আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম কখন আশ্বিন মাস আসিবে, আমি এখান হইতে পলাইব, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

'সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে, না জানি, এই পৃথিবীর মোহ-পাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে'।

(মহর্ষির আত্মজীবনী দ্বিতীয় সংস্করণ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ১১৫ হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রমণ স্পৃহা চরিতার্থ করিতে দেশে, বিদেশে, জলপথে ও স্থলপথে কত কত স্থান যে পর্য্যটন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না; তাঁহার ভ্রমণের প্রধান প্রধান স্থান এই :—স্বদেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব ও তদান্তর্গত হিমাচল, বম্বে প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও আসাম। আমরা সে সমস্ত বিবরণ ইহাতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ যে পুলকিত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

স্বদেশ (বঙ্গদেশ) পর্য্যটন।

"১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।" আমি তাহাঁকে সঙ্গে

লইলাম। তাঁহার জন্য অন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন—আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটী সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর। রাজনারায়ণ বসুর পিতার নাম নন্দ কিশোর বসু, তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপেও তাঁহার ধর্ম্মভাব, নম্রভাব দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছিলাম, তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন—'যদি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয় তবে বড় ভাল হয়।' জীবিতাবস্থায় তিনি তাহার সে ইচ্ছার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজনারায়ণ বাবু সেই অশৌচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম, তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত দিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল।

তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া, দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি

১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম। তখন তিনি আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন; তাঁর সঙ্গে ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি তাঁহাকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করিতাম। যখন আমি পরিবার লইয়া বেড়াইতে চলিলাম, তখন রাজনারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম। তিনি সেই বোটে আমার সঙ্গে রহিলেন। পিনিসে আমার স্ত্রী পুত্র সকলে উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে, তাহার প্রতিধূলে, অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম হুগলী আসিতে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর দুই দিন পরে কাল্‌নাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কত দূরেই আসিয়াছি। এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে, চল, আমরা বোটের ছাতের উপর গিয়া বসি। তিনি বলিলেন যে, এখন বেলার অনেক বাকী, ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে? এইরূপে তাঁহার সঙ্গে

কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় দেখি পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, চল আমরা পিনিসে যাই। ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়। মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাতের উপর বসিয়া আছি এবং দুইজন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তুলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের একজন দাঁড়ী লগি দিয়া ছাড়াইতে ছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ান দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় হইল। সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল, মহা গোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তুলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশ্‌মার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশমার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি

টানিয়া চশ্‌মা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম। ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তুলটি তাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া তাহার ছাতের উপর পড়িল। সেইখানে আমি পূর্ব্বে বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পালভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল, যে দুই জন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এককেতে হইয়া চলিল। সে দিক্‌টা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া মাস্তুলে জড়ান দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল।

আন্‌ দা, আন্‌ দা। কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। একখানা ভোঁতা দা লইয়া একজন মাস্তুলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তার পরে আঘাত, কিন্তু এ

ভোঁতা দায়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজনারায়ণ বাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, আবার তাইরে তাই। বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম, রাজনারায়ণ বাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম। এখন ডাঙ্গা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল "থামা থামা"। তখন সূর্য্য অস্ত গেল। মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল। পিনিস থামিল কিনা অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি, একটা ছোট নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি? আমার ভয় হইল। সেই নৌকা হইতে

লাফাইয়া একজন পাড়ের উপর উঠিল, দেখি যে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে একখানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আছে। সে বলিল কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে আপনার খোঁজে নৌকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে। কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই, আমার এত কষ্ট সার্থক যে, আমি আপনাকে ধরিলাম। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্র পাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম, সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পড়িলাম। এখন আর কি হইবে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না। পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরিলাম। আমি যে বোটে ছিলাম তাহা ১৪ টা দাঁড়ের বোট। ইহার ভিতরকার দুই পার্শ্বে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ ফরাস পাতা। আমি স্ত্রী পুত্র দিগকে তাহাতে লইলাম। রাজ নারায়ণ বাবুকে সমস্ত পিনিসের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে

বলিলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গার স্রোতে, দাঁড়ে পালে নক্ষত্র বেগে বোট ছুটিল। কিন্তু মন তাহার আগে ছুটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল। মধ্য পথে কালনাতে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল যে, নৌকা ডুবু ডুবু হইয়া পড়িল, নৌকা কিনারা দিয়াই যাইতেছিল। মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটা মুড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। বোট রক্ষিত হইল। তখন সেই মুড় গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং পরম বন্ধু বলিয়া আমার মনে হইল। পাঁচ মিনিট পরেই আবার আমার মনের আবেগে বোট খুলিয়া দিলাম। যখন বেলা প্রায় অবসান, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্য্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সুখসাগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সূর্য্য যখন অস্ত হইল, তখন আমি ফরাসডাঙ্গায়। সেখানে দাঁড়ীদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল। এ বিষম ব্যাঘাত। এখান হইতে পলতায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল, দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত অনবরত বৃষ্টি

পড়িয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে দুই এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়িরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছে। পলতায় পঁহুছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ি প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। আমি সেই যে বোটে বসিয়া ছিলাম একবারও তাহা হইতে উঠি নাই, এখন গাড়ির কথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে সেখানে আমার এক হাঁটু জল। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে। সকলই বৃষ্টির জল। আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতেও পারি নাই। যদি পলতায় গাড়ি না থাকিত— যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম, তবে পথে জল ভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকেও বলিতেও পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়িতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়, সেই জলের ভিতরে গাড়ির চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতি কষ্টে বাড়ী পঁহুছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রী পুত্র দিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতলায় উঠিলাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সদাই ইষ্টসাধন অর্থাৎ ভজন পূজনে রত থাকিতেন। এ সত্ত্বেও তাঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি দেশ পর্য্যটনে ও প্রকৃতির দৃশ্য দর্শনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ও বনে বনে ভ্রমণে বিরত ছিলেন না। তিনি আনন্দময় ঈশ্বরের প্রসাদে সতত প্রসন্ন চিত্তে থাকিতেন ও কর্ত্তব্য পালনে সানন্দে যত্ন করিতেন। এ সমস্তই তাঁহার একই লক্ষ্যে সংসাধিত হইত। ব্রহ্মই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, একথা অনেক স্থলে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ভগবৎসেবার কার্য্যাবলম্বনে স্বীয় জীবনকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতেন। একারণ শোক দুঃখ তাঁহার চিত্তকে ততটা আক্রমণ করিতে পারিত না। যদিও ঘটনা বিশেষে তাঁহার মন কখন কখন বিষাদিত হইত তাহা অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিত না। সুখস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত সেবকের মনপ্রাণে বিবিধ প্রকারে তাঁহার

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি জানেন কিসে তাঁহার প্রেমিক সাধকের চিত্ত সমাহিত হইতে ও পুলকিত থাকিতে পারে এবং কোন অবস্থার পর কিরূপ ভাব তাঁহার জীবনে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আনন্দের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। সর্ব্বদাই পরম পিতা তাহার সহায়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি তাঁহার যথার্থ ধর্ম্ম কর্ম্মপালনকারীকে গোপনে গোপনে উৎসাহিত করেন ও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার স্বীয় ইচ্ছার সহিত ঐ ভক্তসেবকের ইচ্ছা মিলাইয়া উভয় ইচ্ছা সংযোগে কত মহৎ ও আনন্দপ্রদ ঘটনার সূত্রপাত করিয়া থাকেন ইহা হইতেই কর্ম্মৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রাণ সাধক দিব্যচক্ষুতে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া কর্ম্মের পর কর্ম্মপ্রবাহ ভগবৎ সেবারূপ স্রোতস্বতীর লহরী বলিয়া সদানন্দে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। এই লহরী হইতেই মনে সৎসাহস উৎপন্ন হয়। সাধুমহাত্মাগণ ঐরূপ সাহসের একান্ত পক্ষপাতী। আত্মজ্ঞান আত্ম-

বল ও কর্ম্মোদ্যম এ সকলই সৎসাহসে জাগ্রত থাকে এবং কি ধর্ম্ম কি কর্ম্মক্ষেত্রে অভ্যস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের পক্ষে তাহা বিশেষ হিতকারী হয়। মহাত্মা St Francis de sales বলিয়াছেন—"Keep your heart brave and ready for any service that shall be imposed upon it according as you undertake many things for God. He will second you and work with you."

(হে সাধক!) "ভগবৎসেবার কার্য্যে হৃদয়কে সৎসাহসে পূর্ণ কর ও প্রস্তুত রাখ। তাঁহার জন্য তোমার অনেক অবলম্বিত কার্য্যের মধ্যে যখন যেটা হৃদয়ে আসিয়া সুসম্পন্ন হইবার জন্য উপস্থিত হইবে তাহা তিনি সমর্থন করিবেন এবং তোমার সহিত তিনি স্বয়ং সেকার্য্য করিবেন।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে উক্ত মহৎ তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি এবং নিজেদের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছি।

তাঁহার জীবদ্দশায় যে কেহ তাঁহার নানাবিধ কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের ভাবগতিক সন্দর্শন করিত সেই তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। নিষ্কাম পুরুষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন এইরূপেই হইয়া থাকে। স্বদেশে অর্থাৎ বঙ্গে পর্য্যটন কালে তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের কার্য্য সমূহ যেরূপ ব্যাপকভাবে অবলম্বিত ও সুসম্পন্ন হইত তাহার বর্ণন হয় না। বিচরণ মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মসাধন ও ভগবৎ যশ ঘোষণার প্রবল স্পৃহা নিগূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিত, তাহা অনুশীলন করিলে হৃদয়ে কত না ধর্ম্মভাব ও ভগবৎভক্তির উদয় হইয়া থাকে। অভ্যস্তভাবে কর্ম্মযোগ শিক্ষার পক্ষে এইরূপ আদর্শ বিশেষ উপকারী। মহর্ষির আত্মজীবনীর একবিংশ পরিচ্ছেদ পাঠে এবিষয়ের তত্ত্ব ও বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাই আমরা ঐ পরিচ্ছেদটী সম্পূর্ণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কতকগুলি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমি দামোদর নদীতে বেড়াইতে যাই। সাত দিন সেই দামোদরের বাঁক ঘুরিয়া

ঘুরিয়া এক দিন বেলা চারিটার সময় তাহার তীরের একটা চরায় নৌকা লাগাইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে, বর্দ্ধমান ইহার খুব নিকটে, দুই ক্রোশ দূরে। অমনি আমার বর্দ্ধমান দেখিতে কৌতূহল হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ চড়া ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান চলিলাম। রাজনারায়ণ বাবু আর দুই একজন আমার সঙ্গে সহরে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে জ্বলিতেছে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইয়া সহর দেখিলাম, বাজার দেখিলাম, রাজ বাড়ী দেখিলাম। রাজ বাড়ীর মধ্যে বাতীর আলোকে আলোকিত একটা ঘরে রাজা যেন বসিয়া আছেন, শার্শীর বাহির হইতে আমাদের এমনি বোধ হইল।

আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করিয়া আবার দামোদরের সেই চড়া ভূমি দিয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু এত পর্য্যটন বোধ হয় কখনো করেন নাই। আমাদের সঙ্গে তিনি আর চলিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক কষ্টে নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, দেখি, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। পরদিন বেলা প্রথম প্রহরে তরুণ সূর্য্য-রশ্মি-বিধৌত সেই দামোদরের পূর্ণ স্রোতে স্নান

করিয়া নীল পট্টবস্ত্র পরিধান করিলাম এবং নিয়মিত উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। এমন সময়ে দেখি সেই, চড়া ভাঙ্গিয়া একখানা সুন্দর ফিটেন গাড়ি চারিদিকে বালুর মেঘ তুলিয়া আসিতেছে। সেখানে উষ্ট্রের পথ সেখানে কি ভাল গাড়ী চলিতে পারে, না ঘোড়া দৌড়িতে পারে? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে এমন স্থান দিয়া ইহারা কোথায় যাইতেছে। দেখি যে, সে গাড়ি আমার বোটের সম্মুখে দাঁড়াইল। কোচ বাক্স হইতে একজন লাফাইয়া পড়িল, সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।

আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি চাও? সে যোড়করে আমাকে বলিল যে, "বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া এই গাড়ী পাঠাইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" আমি বলিলাম "এখন আমি নদী, বন, পাহাড়, পর্ব্বত দেখিতে বাহির হইয়াছি এখন আমি কোথায় রাজ দর্শন করিতে যাইব? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙ্গায় উঠিব না।" সে বলিল যে, "আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইব। আপনি আমার প্রতি সদয়

হউন। একবার রাজাকে দর্শন দিন। আপনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিলে, আপনি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি আপনাকে না লইয়া যাইব না।" তার এত কাতরতা ও মিনতি দেখিয়া আমি যাইতে স্বীকার করিলাম। আমি ভোজন করিয়া দুই প্রহরের পর বর্দ্ধমানে চলিলাম, যখন পঁহুছিলাম, তখন বেলা অবসান হইয়াছে। নানা উপকরণে সুসজ্জিত একটি বাসস্থান আমার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা আমাকে ঘেরিয়া বসিল, তাঁর গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে কীর্ত্তি চাটুর্য্যে সকলেই আমার কাছে হাজীর। আমার বাসা হইতে রাজ বাড়ী পর্য্যন্ত আমি কি করিতেছি, কি বলিতেছি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই সংবাদ লইবার জন্য ডাক বসিয়া গেল। পর দিন প্রাতে তিন চারি খানা গরুর গাড়ি করিয়া চাল, ডাল, ময়দা, সুজী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আমার বাসাতে আসিয়া উপস্থিত। আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এত জিনিস কেন?" তাহারা বলিল যে, "রাজগুরুর জন্য যে সিধা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সিধা আপনাকে পাঠাইয়াছেন।"

তাহার পরে দুই প্রহরের সময় জুড়ি আসিয়া আমার দরজায় দাঁড়াইল। আমি সেই গাড়ীতে চড়িয়া রাজ

বড়ীতে চলিয়া গেলাম। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমিও তাঁহার বিলিয়ার্ড খেলার আমোদে যোগ দিলাম। তিনি আমাকে ধরিয়া একটা উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার নম্রতা বিনয় ও অনুরাগ দেখিয়া আমারও অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। আমার সহিত এই প্রকারে তাঁহার সম্মিলন হইল এবং ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে তাঁহার উৎসাহ বাড়ীতে লাগিল। তিনি আমার পরামর্শে রাজ বাড়ীর মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। এই ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর কার্য্যের এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মে রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য আমি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে এবং তারক নাথ ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। ইহার পর আমি সর্ব্বদাই বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতাম এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতাম। তিনিও আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার জন্মোৎসব তাঁহার বনভোজনে যখন যে উপলক্ষে সেখানে যাইতাম, আমার সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা হইতই হইত। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। এক রাত্রিতে ব্রহ্মো-পাসনার সময়ে তিনি বক্তৃতা করিলেন—"আমি কি অকৃতজ্ঞ

তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন, আমি তাঁহার জন্য তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয়, তাঁহাকে পূজা করে, আমি কি অকৃতজ্ঞ! কি অধম।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি আমাকে তাঁহার অন্তঃপুরেই লইয়া গেলেন। সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে, আমাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আমরা এখানে বসিয়া মাছ ধরি।" উপরে দোতলায় লইয়া গেলেন—দেখি, সেখানে জরির মছনদ পাতা বিবাহের বাড়ীর সজ্জার মত সব সাজান। তিনি বলিলেন "এইখানে আমরা বসি।" আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন যে "এখান হইতে রাণী আমার বিলিয়ার্ড খেলা দেখিতে পান।" তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, রাজা যেমন রাণীর প্রতি সন্তুষ্ট, রাণী তেমনি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট। "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়াভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈব চ।" একদিন রাজা আমাকে বলিলেন—"আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।" আমি ভাবিলাম, না জানি কি বলিবেন। আমি বলিলাম, কি প্রার্থনা? তিনি বলিলেন "আপনাকে

একটী পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বসিতে হইবে—আপনার একটা ছবি লইব।" তাঁহার বাড়ীতে তখন একজন ভাল কারু ইংরাজ আসিয়াছিল, সে আমার ছবি লইল। আমার তখনকার সেই ছবি এখনো তাঁহার ঘরে আছে। রাজা মহাতাব চাঁদ আর নাই, তাঁহার পুত্র আবতাব চাঁদও অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ এখনো রহিয়াছে। অদ্যাপি একজন উপাচার্য্য প্রতিনিয়ত ব্রহ্ম নাম ধ্বনিত করেন, কিন্তু তাঁহার কেহ শ্রোতা নাই। সেই শূন্য সমাজ গৃহের অধিষ্ঠাতৃদেবতাই তাহার একমাত্র দীপ। একদিন কলিকাতায় আমি গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে যাইতে ছিলাম, একজন আসিয়া সেই পথে আমার হাতে একখানা পত্র দিল। খুলিয়া দেখি, সে পত্র কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন যে, "কল্য পাঁচটার সময় টাউনহলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব।" আমি তাহার পরদিন পাঁচটার সময় টাউনহলে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছি, একটু পরে তিনি আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন। পরস্পরের সম্মিলনে বড়ই সুখী হইলাম। সেখানে তিনি আমার সহিত কেবলই ধর্ম্মালোচনা করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, "এখানে এত অল্পক্ষণে আলাপ করিয়া

পরিতৃপ্ত হইলনা। আমি কলিকাতায় এখনো তিন চারি দিন আছি, যদি ইহার মধ্যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় যাইয়া আলাপ করেন তবে বড় সুখী হই।” তিনি প্রকাশ্যে আমার সহিত দেখা করিতে সঙ্কোচিত।

আমি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, ব্রাহ্ম; আর তিনি নবদ্বীপাধিপতি পৌত্তলিক সমাজের কর্ত্তা। আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম আলাপ, তিনি আপনিই আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া আমি সর্ব্বদাই সেখানে যাইতাম। তিনি লোক মুখে আমার কথা শুনিয়া, আমার বক্তৃতাদি পড়িয়া, আমার সহিত আলাপ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসাতে গেলাম। আমাকে তিনি তাঁহার দোতালার ছাদের উপরে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি দীপও নাই গিয়াই তিনি অমনি মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সেখানে মাটীতে বসিলাম। বেস ফকিরী ভাব হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—“একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ্যঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ”। তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহার সহিত আমার বড়ই

সদ্ভাব জন্মিয়া গেল—আমরা এক হৃদয় হইয়া গেলাম। বিদায় পাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে "এবার কৃষ্ণ নগরে যখন যাইবেন, তখন এক রাত্রি আমার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে হইবে—থাকিবেন কি?" আমি বলিলাম যে "ইহা হইতে আহ্লাদ ও সৌভাগ্য আর কি আছে? আমাকে আপনি যখনি ডাকিবেন তখনি যাইব।" তাহার পরে আমি কৃষ্ণ নগরে গেলে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমি সন্ধ্যার সময় তাঁহার রাজ বাটীতে গেলাম। তিনি আমাকে একটী নিভৃত সুন্দর কুঠরিতে লইয়া বসাইলেন। সেখানে আর কেহ নাই, কেবল তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র আছেন। আমাদের আমোদের জন্য তাঁহার ধ্রুপদ সকল শুনাইলেন। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত গানই চলিল। ষাট্ প্রকারের ব্যঞ্জন দিয়া আমাকে ভোজন করাইলেন। তাঁহার বাড়ীতে শয়ন করিলাম। খুব ভোরে রাজা আপনি আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং তাঁহার পূজার বাড়ী দেখাইয়া প্রভাতেই আমাকে বিদায় দিলেন। সেই সময়ে ধর্ম্মযোগে এই দুইটি রাজার সহিত আমার যোগ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একজন প্রকাশ্যে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক জন খুব গোপনে কিন্তু খুব অন্তরে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পর্য্যটন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং জৈমিনী প্রদেশে ভ্রমণ কালে তাঁহার উদ্যম, শ্রম, প্রকৃতির মধ্যে নানা দৃশ্য দর্শন এবং নানা স্থলের বর্ণন পাঠ করিলে কাহার না মন প্রাণ পুলকিত হয়? কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি ও তদন্তর্গত দ্রষ্টব্য স্থানসকল বিশেষ-ভাবে পর্য্যটন করিয়া তিনি কত যে ধর্ম্মতত্ত্ব ও কর্ম্ম-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিয়া-ছিলেন তাহা তিনি যেরূপ মনোহর ভাবে তাঁহার আত্মজীবনীতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

"আমি যে আশ্বিন মাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত হইল। কাশী পর্য্যন্ত একশত টাকায় একটি বোট ভাড়া করিলাম। ১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন

বেলা ১১টার সময় গঙ্গায় জোয়ার আইল, আমার মনেও নব উৎসাহের উৎস ছুটিল। আমি গিয়া সেই নৌকাতে আরোহণ করিলাম। নোঙর উঠিল, বোট চলিল, আমি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম।

(হাফিজের উক্তি)

"আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি, হে অনুকূল! তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের দর্শনীয়, বন্ধুকে দেখিতে পাইব।" আশ্বিন মাসের গঙ্গার প্রতিকূল স্রোতে নবদ্বীপে পঁহুছিতে ছয় দিন লাগিল। গঙ্গার মধ্যে একটা চড়াতে রাত্রিতে থাকিলাম। চারিদিকে গঙ্গা, মধ্যে এই দ্বীপটি ভাসিতেছে। প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির জন্য দুই দিন এখান হইতে আর নড়িতে পারিলাম না। ১৬ কার্ত্তিকে মুঙ্গেরে পঁহুছিলাম। ভোর ৪টার সময়ে এখান হইতে সীতাকুণ্ড দেখিতে চলিলাম। নৌকা হইতে তিন ক্রোশ হাঁটিয়া সূর্য্যো-দয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পঁহুছিলাম। সেই কুণ্ডের জল এত তপ্ত যে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। তাহার চারিদিকে রেল দেওয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাতে রেল দেওয়া কেন? সেখানকার লোকেরা বলিল, "যাত্রীরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তাই হাকিমের হুকুমে

রেল দেওয়া হইয়াছে” আমি তাহা দেখিয়া আবার সেই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া ক্ষুধিত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত হইয়া বোটে ফিরিয়া আইলাম। “পরিশ্রান্তে ম্রিয়া আহহং তৃট্ পরীতো বুভুক্ষিতঃ” তাহার পরে ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া চলিতেছি, এমন সময়ে প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ডাঙ্গার দিকে লইয়া গেল। ডাঙ্গায় তো আসিল, কিন্তু প্রতিকূল ঝড় গঙ্গার উচ্চপাড়ে নৌকাতে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙ্গে, আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। আমি সেই দোলায়মান বোট হইতে উঠিয়া পাড়ের উপর .দাঁড়াইলাম। সেখানে ভূমি যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির; চড়ার বালু যেন ছিটাগুলির মত আমার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা চাদর গায়ে দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার সেই প্রমত্ত ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যে সেই “মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং” পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গের পান্সীখানা সকল আহারীয় সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া গেল। পরে আমরা পাটনায় আসিয়া নূতন আহারের সামগ্রী লইলাম। সেখানে গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল, নৌকা আর চলিতে পারে না। সেই দুর্জ্জয় স্রোতের প্রতিকূলে পাটনা ছাড়াইয়া ৬ই অগ্রহায়ণে কাশীতে পঁহুছিলাম।

কলিকাতা হইতে কাশী আসিতে প্রায় দেড়মাস লাগিল। প্রাতঃকালেই সেই বোট হইতে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া, কোথায় থাকি, কোথায় বাসা পাই, তাহা দেখিতে দেখিতে শিক্‌রোলের দিকে চলিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি, একটা বাগানের মধ্যে একটা ভাঙ্গা শূন্য বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে একটা কূপের ধারে কতকগুলা সন্ন্যাসী বসিয়া জল্পনা করিতেছে। আমি মনে করিলাম, এ বাড়ীটা বুঝি সাধারণের জন্য, এখানে যে সে থাকিতে পায়। এই মনে করিয়া আমার জিনিষ পত্র লইয়া সেই বাড়ীতে উঠিলাম। তাহার পরদিন দেখি যে, কাশীর প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র গুরুদাস মিত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভাবিলাম, আমার এখানে আসিবার কথা ইনি কেমন করিয়া জানিলেন? আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া আমার নিকটে বসাইলাম। তিনি বলিলেন যে, "আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আপনি আমাদের এ বাড়ীতে উঠিয়াছেন।"

এ বাড়ীর দরজা নাই, পর্দ্দা নাই, আবরণ নাই হিম পড়িতেছে। না জানি, রাত্রিতে আপনার কতই কষ্ট হইয়া থাকিবে। আপনার এখানে আগমন হবে তাহা পূর্ব্বে জানিলে সকলি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম।" তিনি

অনেক শিষ্টাচার করিলেন এবং সেইস্থান আমার বাসোপযোগী করিয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিলেন। কাশীতে দশ দিন ছিলাম—বেশ আরামে ছিলাম। আমি একটা ডাকগাড়ী করিয়া ১৭ই অগ্রহায়ণ কাশী ছাড়িলাম। সঙ্গে যে সকল চাকর ছিল তাহাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া দিলাম, কেবল দুইজন চাকরকে সেই গাড়ীর ছাতে বসাইয়া লইলাম। কিশোরীনাথ চাটুয্যে এবং কৃষ্ণনগরের একজন গোয়ালা, এই দুই জনকে সঙ্গে লইলাম। তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময়ে এলাহাবাদের পূর্ব্বপারে পঁহুছিয়া আমার গাড়ী একখানা পারের খেওয়ার নৌকাতে চড়াইয়া রাখিলাম। ভয়, পাছে ভোরে পারের নৌকা না পাই। আমি সেই নৌকার উপরে গাড়ীর মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রাটা ভোগ করিলাম। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সেই পারের নৌকা শিথিল ভাবে চলিয়া বেলা দুই প্রহরের সময়ে ওপারে পঁহুছিল। দেখি যে, কেল্লার নীচে গঙ্গার চড়াতে অনেকগুলি ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে, এই সকল ধ্বজা যজমানদিগের পিতৃলোকে সমুন্নত হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডারা অর্থ সংগ্রহ করে। এই প্রয়াগ তীর্থ; এই প্রসিদ্ধ বেণীঘাট। এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে

পঁহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। একজন পাণ্ডা বলিল "এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর" বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমি এ তীর্থে যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করিব না। আর একজন বলিল "তীর্থে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও"। আমি বলিলাম, আমি কিছুই দিবনা, তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও। সে বলিল, "হাম পয়সা লেকে তব্ ছোড়েঙ্গে পয়সা দেনেহি হোগা"। আমি বলিলাম, হাম পয়সা নহী দেগা, কিস্তরে লেগা লেওতো? এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া পড়িল এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুণ ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল খানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল। বলিল, "হাম তো কাম কিয়া অব পয়সা দেও"। আমি বলিলাম, এ ঠিক হইয়াছে, আমি হাসিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। দুই প্রহর বাজিয়া গেল, তখন এইরূপ কষ্ট করিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নির্দ্দিষ্ট খেওয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম। তাহার পরে দুই ক্রোশ গিয়া একটা বাঙ্গালা পাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম। এলাহাবাদ ছাড়িয়া ২২শে অগ্রহায়ণে আগ্রাতে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার ডাকের গাড়ী দিনরাত্রি

চলিত; মধ্যাহ্ন সময়ে পথের একটা গাছের তলায় রন্ধন করিয়া আহার করিতাম। আগ্রায় আসিয়া "তাজ" দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। নীচে নীল যমুনা। মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্র-মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

যমুনা প্রদেশ ভ্রমণ ও মথুরা বৃন্দাবনের দৃশ্য বর্ণন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণ, বিবিধ ধর্ম্মের উপাসক সম্প্রদায় ও তীর্থাদির বিবরণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবার স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম পরব্রহ্মের উপাসক হইয়াও সে স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য কত না সমুৎসুক থাকিতেন। সচরাচর দেখা যায় যে একেশ্বর বাদী যাঁহারা তাঁহারা মূর্ত্তি পূজা সম্বলিত ধুম-ধাম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রভাব যেখানে বিদ্যমান সেখানে যাইতে বা তাহার কোন খোঁজ খবর লইতে চাহেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যেখানেই কোন রূপ ধর্ম্ম সম্পর্ক আছে জানিতেন সেই খানেই তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার সার অসার তত্ত্ব নিরীক্ষণ

করিতেন। কি দেশ, কি কাল, কি পাত্র সম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বই তিনি নিপুণভাবে অবলোকন ও তাহার জ্ঞান লাভ করার পক্ষে তাহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। তিনি এই সমস্তের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা—বিশ্ব-বিধাতার হস্ত দর্শন করিতে সতত প্রয়াসী ছিলেন। ফলে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর উদার ও প্রশস্ত হৃদয় যেরূপ হওয়া চাই তাহাই তাঁহার ছিল। তিনি তাঁহার ভ্রমণ পথে কাশী, প্রয়াগ স্থান পর্য্যটন করিয়া পরে মথুরা ও বৃন্দাবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করি-লেন এবং তৎপরে দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার আত্মজীবনী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমি এই যমুনা দিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ দিল্লী যাত্রা করিলাম। পৌষ মাসের শীতে কোন কোন দিন আমি যমুনাতে অবগাহন করিতাম, তাহাতে আমার শরীরের রক্ত জমাট হইয়া যাইত। বজ্‌রা চলিত, কিন্তু আমি যমুনার ধারে ধারে শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, গ্রাম ও উদ্যানের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতাম।

তাহাতে আমার মনের বড়ই শান্তি হইত। ১১ দিনে এই যমুনা তীরে মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইলাম।

* * * *

পরে বৃন্দাবনে পঁহুছিলাম, সেখানে লালাবাবুর কীর্ত্তি গোবিন্দজীর মন্দির দেখিতে গেলাম। নাটমন্দিরে চারি পাঁচজন বসিয়া সেতারের বাজানা শুনিতেছে। আমি গোবিন্দজীকে প্রণাম করিলাম না দেখিয়া তাহারা সচকিত হইল। আগ্রা হইতে একমাসে দীল্লির চড়াতে আসিয়া ২৭শে পৌষে আমার বজ্‌রা লাগিল। দেখিলাম—উপরে বড়ই ভিড়। সেখানে দীল্লির বাদসাহ ঘুঁড়ি উড়াইতেছেন এখন তো তাঁহার হাতে কোন কাজ নাই, কি করেন? দীল্লির সহরে গিয়া বাজারের উপর একটা বাড়ী ভাড়া করিলাম। আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি দীল্লি সহরের বড় রাস্তার ধারে বাজারের উপরে রহিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি এ সংবাদ পরে জানিলাম।

* * * *

এখান হইতে প্রসিদ্ধ কুতব-মিনার ৮ ক্রোশ দূর। আমি তাহা দেখিতে গেলাম। ইহা হিন্দুর পূর্ব্ব কীর্ত্তি। মুসল-

মানেরা এখন ইহাকে কুতবুদ্দীন বাদসাহের জয়স্তম্ভ বলে, এইজন্য ইহার নাম কুতব-মিনার। হিন্দুদিগকে মুসলমানেরা যেমন পরাজয় করিল, তেমনি তাহাদের কীর্ত্তিও লোপ করিল। মিনার কিনা উন্নত স্তম্ভাকার প্রাসাদ। কুতব-মিনার প্রায় ১৬১ হাত উচ্চ। আমি সেই মিনারের সর্ব্বোচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ নভোমণ্ডলের নিম্নে মহদায়তন ভূমির বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত হইলাম, এ সেই মহতোমহিয়ানেরই মহিমা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ ও অমৃত সহরের দৃশ্য বর্ণন।

পঞ্জাবে পৌঁছিয়া শিকেদের প্রধান ধর্ম্মমন্দির গুরুদত্তরা দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ভাবপূর্ণ হৃদয়ে কত কত আনন্দের ভাব উদ্ভাষিত হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভাব দেখিয়া তাহার তত্ত্ব নিরূপণ ও তাহা হইতে আত্মজ্ঞান লাভের প্রবল স্পৃহা চরিতার্থ করিতেন। পঞ্জাব প্রদেশে শিক ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানেরই ধর্ম্ম, তাহা এখন পর্য্যন্ত জাগ্রত ভাবে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে এবং পাখওয়াজ ও রবাবাদি বাদ্য যন্ত্র যোগে রাত্রি দিন ভগবৎ যশো-গানের যে ধ্বনি উঠিতেছে তাহা দেখিলে কাহার না হৃদয় মুগ্ধ হয়? মহর্ষি স্বয়ং বিচরণ করিয়া সে সকল বিশেষ করিয়া দেখিলেন এবং শিকেদের ধর্ম্ম ও

কর্ম্ম জীবনকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এস্থলে আমার বক্তব্য না বলিয়া মহর্ষিদেব নিজের কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এখান দীল্লি হইতে ডাকের গাড়ী করিয়া আরো পশ্চিমে অম্বালায় পঁহুছিলাম। এখানে ডুলি করিলাম এবং কেবল কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া লাহোরে গেলাম, লাহোর হইতে ফিরিয়া ৪ঠা ফাল্গুনে অমৃতসরে পঁহুছিলাম। তখন এখানে বিলক্ষণ শীত অনুভব করিলাম।

যদিও আমি অমৃতসরে পঁহুছিয়াছি, তথাপি আমার লক্ষ্য সেই অমৃতসর—সেই অমৃতসরোবর, যেখানে শিখেরা অলখ-নিরঞ্জনের উপাসনা করে। আমি অতি প্রত্যূষেই অমৃতসর সহর দিয়া সেই পুণ্যতীর্থ অমৃতসর দেখিতে ধাবিত হইলাম। অনেক পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, অমৃতসর কোথায়? সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এহি তো অমৃতসর।" আমি বলিলাম, নহী—বো অমৃতসর কাঁহা, যাঁহা পরমেশ্বরকা ভজন হোতা হ্যায়। বলিল,

"গুরু দ্বারা ? বো তো নজদিগই হ্যায়, ইসী রাস্তাসে যাও।" আমি সেই নির্দ্দিষ্টপথে গিয়া লাল বনাতের শাল রুমালের বাজারের বাহিরে দেখি যে, মন্দিরের স্বর্ণ মণ্ডিত চূড়া তরুণ সূর্য্য কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া মন্দিরে গিয়া দেখি, কলিকাতার লালদীঘির ৪।৫ গুণ হইবে এমন একটা বৃহৎ পুষ্করিণী, তাহাই সরোবর। মাধবপুর হইতে জলপ্রণালী দিয়া ইরাবতী নদীর জল আসিয়া সেই সরোবরকে পূর্ণ রাখে। গুরুরাম দাস এই উৎকৃষ্ট সরোবর এখানে খনন করিয়া ইহার নাম অমৃতসর রাখেন। ইহার পূর্ব্ব নাম "চক্" ছিল। সেই সরোবরের মধ্যে উপদ্বীপের ন্যায় শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। একটা সেতু দিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তাহার সন্মুখে একটা বিচিত্রবর্ণ রেশমের বস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ স্তূপাকৃতি হইয়া গ্রন্থ সকল রহিয়াছে। মন্দিরের একজন প্রধান শিখ তাহার উপর চাঁমর ব্যজন করিতেছে। একদিকে গায়কেরা গ্রন্থের গান সকল গাহিতেছে। পঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষেরা আসিয়া মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং কড়ি ও ফুল ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বা ভক্তি-ভাবে সঙ্গীত করিতেছে। এখানে যে যখন ইচ্ছা এসো,—এখানে যে যখন ইচ্ছা চলে যাও—কেহ

কাহাকে ডাকেও না; কেহ কাহাকে বারণও করেনা। এখানে খ্রীষ্টান মুসলমান সকলেই যাইতে পারে—কেবল নিয়ম এই যে, গুরুদ্বারা সীমানার মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পারে না। * * * আমি আবার সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরে গেলাম। দেখিযে, তখন আরতি হইতেছে। একজন শিখ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া গ্রন্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছে। অন্য সকল শিখেরা দাঁড়াইয়া যোড়করে তাহার সঙ্গে গম্ভীর স্বরে পড়িতেছে—'গগণমে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকা মণ্ডলো জেঁাকা মোতী। ধুপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি। কৈসী আরতি হোবে ভবখণ্ডনা, তেরি আরতি, অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী। হরিচরণকমল মকরন্দ লোভিত মনোহনুদিনো মে আয়ী পিয়াসা, কৃপা—জল দে নানক—সারঙ্গকো যাতে হোবে তেরে নামে বাসা।" গগণের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে। ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে। কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে। হরিচরণকমল মকরন্দ লোভিত মন, অনুদিন তাহে মোর পিপাসা রে। কৃপা জল দে চাতক নানকে, যেন হয় তব নামে মম

বাসারে।” আরতি শেষ হইল, তখন সকলকে কড়া ভোগ (মোহনভোগ) দিতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে এই প্রকার দিনরাত্রি সপ্ত প্রহর ঈশ্বরের উপাসনা হয়—মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা মাত্র উপাসনা হয়। আর শিখদিগের হরিমন্দিরে দিনরাত উপাসনা। কাহারো মন ব্যাকুল হইলে নিশীথ সময়েও সেখানে গিয়া উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। এই সদ্দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মদিগের অনুকরণীয়। এখন আর শিখেদের কোন গুরু নাই। তাহাদের গ্রন্থ সকল তাহাদের গুরুস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের শেষ গুরু—দশম গুরু, গুরুগোবিন্দ। তিনিই শিখদের জাতিভেদ নিবারণ এবং তাহাদের মধ্যে “পাহল” বলিয়া যে দীক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা তিনিই সৃষ্টি করেন। সেই “পাহল” আজও চলিয়া আসিতেছে। যে শিখ হইবে তাহাকে আগে পাহল করিতে হইবে। পাহল প্রথা এইরূপ—একটা পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে চিনি ফেলিয়া দিতে হয়.এবং সেই জল খড়্গ বা ছুরিকার দ্বারা নাড়িতে হয় এবং যাহারা শিখ হইবে তাহাদের গাত্রে তাহা ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পর তাহারা সেই চিনির জল সকলে একপাত্রে পান করে। ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, শূদ্র সকল জাতিই* শিখ হইতে পারে—বর্ণ বিচার নাই। মুসলমানও শিখ হইতে পারে। শিখ হইলেই তাহার উপাধি সিংহ হইয়া যায়। শিখেদের এই মন্দিরে কোন প্রতিমা নাই। নানক বলিয়া গিয়াছেন যে, "থাপিয়ানা যাই, কীতা না হোই, আপি আপ্ নিরঞ্জন সোই।" তাঁহাকে কোথাও স্থাপন করা যায় না, কেহ তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিতে পারে না তিনিই সেই স্বয়ম্ভূ নিরঞ্জন।

* * * *

আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলো মেলো গাছ—জঙ্গলারকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা—সকলি নূতন—সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধুবহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। বৈশাখ

মাস আসিয়া পড়িল। তখন সূর্য্যের তাপ অনুভব করিলাম দোতালায় থাকিতাম, একতালায় নামিয়া আইলাম। দুইদিন পরে সেখানেও সূর্য্যের তাপ প্রবেশ করিল। বাড়ীওয়ালাকে বলিলাম--আমি আর এখানে থাকিতে পারিনা; ক্রমে উত্তাপ বাড়িতেছে, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। সে বলিল, "নীচে তয়খানা আছে; গ্রীষ্মকালে সেখানে বড় আরাম।" আমি এতদিনে জানিতাম না যে, ইহার মাটির নীচে আবার ঘর আছে। আমাকে সেই মাটির নীচে লইয়া গেল। সেই নীচে ঠিক তাহার উপরের একতালার মত ঘর। পাশ দিয়া আলোক ও বাতাস আসিতেছে—সে ঘর খুব শীতল। কিন্তু আমার সেখানে থাকিতে পছন্দ হইল না। মাটির ভিতরে ঘরের মধ্যে বন্দির ন্যায় থাকিতে পারিব না।

আমি চাই মুক্ত বায়ু প্রমুক্ত গৃহ। আমাকে একজন শিখ বলিল যে, "তবে শিমলা পাহাড়ে যান, সে বড় ঠাণ্ডা জায়গা।" ১৬৭৯ শকের ৯ই বৈশাখে শিমলার অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জোর ছাড়াইয়া ১২ই বৈশাখে কাল্‌কা নামক উপত্যকায় আসিয়া পঁহুছিলাম। দেখি যে, সম্মুখে পর্ব্বত বাধা দিয়া রহিয়াছে। আমার নিকটে অদ্য ইহার নূতন মনোহর

দৃশ্য বিকশিত হইল। আমি আনন্দে ভাবিতে লাগিলাম যে, কাল আমি ইহার উপরে উঠিব, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিব। এই আনন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। সুখে নিদ্রা হইল—পথের পরিশ্রম দূর হইল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শিমলা ও পার্ব্বতীয় দেশ ভ্রমণ।

যাঁহাদের প্রাণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বা ক্ষুদ্রতা হইতে ক্রমে বৃহতে গিয়া পৌঁহুছিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মে সংলগ্ন হইয়াছে তাঁহাদিগের নিকট অনন্তের পথ সহজেই খুলিয়া যায়। তাঁহারা কি ভৌতিক কি আত্মিক অবস্থায় উর্দ্ধগামী হয়েন। তাহাতে তাঁহাদের আত্মানন্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এখন শিমলা পর্ব্বতে অধিক দূর উঠেন নাই কিন্তু সম্মুখে ঐ উচ্চ পর্ব্বতের দৃশ্য দেখিয়াই কতনা তাঁহার আনন্দানুভব হইল—"সুখে নিদ্রা হইল—পথের পরিশ্রম দূর হইল।"

তাঁহার উক্ত পর্ব্বতে আরোহণ, বিচরণ, বিঘ্নময় ঘটনাদির মধ্যে দিয়া জীবন রক্ষণ প্রভৃতি বিবরণ তাঁহার আত্মজীবনীতে পাঠ করিলে চমকিত হইতে হয়। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পরদিন সকালে চলিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নে একটা বৃক্ষতলে আহার করিয়া সন্ধ্যার সময়ে শিমলার বাজারে উপস্থিত হইলাম। আমার ঝাঁপান বাজারেই রহিল,' দোকানদারেরা আমার প্রতি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আমি ঝাঁপান হইতে উঠিয়া দোকানে তাহাদের জিনিষ পত্র দেখিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী কিশোরীনাথ চাটুর্য্যে বাসার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল এবং সেই বাজারেই একবাসা স্থির করিয়া শীঘ্রই আমাকে সেখানে লইয়া গেল। সেইখানে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। অনেক বাঙ্গালীর সেখানে কর্ম্ম কাজ, তাহারা অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইল। প্যারিমোহন বাঁড়ুয্যা প্রত্যহ আমার সংবাদ লইতে আসিতেন। তিনি সেখানে ইংরাজের একটা দোকানে কর্ম্ম করিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন যে, "এখানে একটী বড় সুন্দর জল প্রপাত আছে, যদি আপনি যান তো আপনাকে তাহা দেখাইয়া আনিতে পারি।" তাঁহার সঙ্গে আমি খদে নামিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। খদের নীচে যাইতে যাইতে দেখি যে, মধ্যে মধ্যে সেখানে লোকের বসতি, মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র। কোনখানে গরু মহিষ চরিতেছে, কোনখানে পার্ব্বতয়ী

মহিলারা ধান ঝাড়িতেছে। আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানেও দেশের মত গ্রাম ও ক্ষেত্র আছে; তাহা আমি এই প্রথম জানিতে পারিলাম। এইরূপে দেখিতে দেখিতে খদের নিম্নতম স্থানে গিয়া আমাদের ঝাঁপান রাখিলাম, আর ঝাঁপান যাইবার পথ নাই। আমরা এখন পার্ব্বতীয় লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই জল প্রপাতের নিকটে শিলাতলে উপস্থিত হইলাম। এখানে তিন শত হস্ত উর্দ্ধ হইতে জলধারা পড়িতেছে এবং প্রস্তরের উপরে প্রতিঘাত পাইয়া রাশি রাশি ফেণা উদ্গীরণ করিতেছে এবং বেগে স্রোত নিম্নমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি একখানা শিলাতলে বসিয়া এই জল ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। যেমন এই জলপ্রপাতের অতি শীতলকণা সকল খদে নামিবার পরিশ্রমে আমার ঘর্ম্মাক্ত শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি আমার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল। আমি ধীরে ধীরে সেই শিলাতলে অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক পরে আবার চৈতন্য হইল— আমি চক্ষু মেলিলাম। দেখি যে, আমার সঙ্গী প্যারী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ একেবারে শুষ্ক, তিনি বিষণ্ণ মনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি অমনি আমার ও তাঁহার অবস্থা স্মরণ

করিলাম এবং তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য হাসিয়া উঠিলাম। আমি এইরূপে জল-প্রপাত দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আইলাম।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শিমলায় সিপাইবিদ্রোহ ও মহাভীতি-উৎপাদক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মহর্ষির অশেষ ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সৎসাহস।

এই মহাবিঘ্ন সঙ্কুল সময়ে মহর্ষি দেবন্দ্র নাথের ধর্ম্মবল ও কর্ম্মজীবনের প্রভাব যেরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে তিনি যে একজন উচ্চ প্রকৃতির ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মযোগী মহাপুরুষদিগের এইভাব মানব কুলে আদর্শরূপে কার্য্যকর ও কল্যাণপ্রদ হয়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে আশ্চর্য্য সম্মন্ধ তাহা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি-দিগের জীবনে কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কি কর্ম্মে এইরূপে বিকশিত হইয়া মানবমণ্ডলে কত না উন্নতি—কত না মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ফলে প্রাগুক্ত ঘটনাক্ষেত্রে মহর্ষির জীবন তাহারি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে যাহা যাহা বর্ণিত আছে তাহা দীর্ঘ হইলেও আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যদ্দারা পাঠকগণ আমাদের উক্ত বক্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

"চিন্তা করিতেছি যে, এই শিমলার গৃহে আমি চিরজীবন সুখে কাটাইতে পারি। এমন সময়ে আমার ঘরের নীচে দেখি যে, রাস্তা দিয়া কতকগুলা লোক দৌড়িয়া যাইতেছে। আমি তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কি হইয়াছে, এত দৌড়িতেছ কেন? উত্তর না দিয়া তাহার মধ্যে একজন আমাকে হাত নাড়িয়া বলিল— "পলাও পলাও"। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন পালাইব? কিন্তু কে কার উত্তর দেয়, সকলেই আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। আমি ইহার কিছুই ভাব বুঝিতে না পারিয়া, প্যারী বাবুর নিকট তথ্য জানিতে চলিলাম। গিয়া দেখি, তিনি দেওয়ালের চুণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকাণের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়াই

বলিলেন, "গুরখারা বামুন মানে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, হয়েছে কি? তিনি বলিলেন যে, "গুরখা সৈন্যেরা শিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে যাইব।" আমি বলিলাম যে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এই কথায় তাঁহার মুখ আরও শুকাইল। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি একাকী খদে পলাইয়া থাকেন—দুইজন একত্রে গেলে পাহাড়ীদের লোভ বাড়িবে, তাতে বাঁচা ভার হইবে। আমি তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিলাম, না, আমি খদে যাইব না। আমি বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি যে, আমাদের বাসায় তালা বন্ধ। আমি ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। একটু পরেই কিশোরী আসিয়া বলিল যে, "টাকার থলেটা আমি উননের ধারে মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর কাঠ চাপাইয়া রাখিয়াছি, আর গুরখা চাকরটাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া চাবি দিয়াছি, গুরখারা গুরখা দেখিলে কিছু বলিবে না। আমি বলিলাম, তাহাতো হইল, তোমার নিজের প্রাণের জন্য কি করিতেছ? সে বলিল "রাস্তার ধারে যে এই নর্দ্দামাটা আছে, গুরখারা আসিলে তাহার মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়া থাকিব—আমাকে কেউ দেখিতে পাইবেনা।" গুরখারা বাস্তবিক

আসিতেছে কিনা, একটা উচ্চস্থানে উঠিয়া তাহা আমি দেখিতে গেলাম। সেখানে গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল—যদি গুরখারা শিমলা আক্রমণ করিতে আসে, তবে সকলকে জানাইবার জন্য তোপ পড়িবে। দেখি যে, খানিক পরে ভয়ানক তোপও পড়িল। তখন আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি হইল, কোন উপদ্রবই নাই; আমি গৃহে গিয়া নিরাপদে শয়ন করিলাম। আমার প্রতি ঈশ্বরের যে করুণা, তাহা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রভাত হইল, আমি শিমলা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলিরা বলিল যে, অগ্রে টাকা না পাইলে তাহারা যাইবেনা। আমি টাকা দিবার জন্য কিশোরী কিশোরী করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় কিশোরী? তাহার কাছে খরচের টাকা ছিল, আর আমার কাছে একটা বাক্সভরা এক বাক্স টাকা ছিল। ভাবিয়াছিলাম, এত টাকা কুলি-দিগকে দেখাইব না। কিন্তু কিশোরী নাই, কুলিরাও টাকা ব্যতীত উঠেনা। আমি তখন তাহাদিগের সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া প্রতিজনকে তিনটা করিয়া টাকা দিলাম। সেই সর্দ্দারটাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলাম, এমন সময়ে কিশোরী উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম "এমন সঙ্কট সময়ে

তুমি এখান হইতে কোথায় গিয়াছিলে ?" বলিল যে," একটা দরজি আমার কাপড় শেলাইয়ের দর চারি আনা অধিক চায় বলিয়া তাহা চুকাইতে এত বিলম্ব হইয়া গেল"। আমি এখন সেই দোলায় চড়িয়া ডগসাহী নামক আর একটা পর্ব্বতে চলিলাম। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় কুলিরা আমাকে একটা প্রস্রবণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে বসিল এবং তাহারা পরস্পর কথাবার্ত্তা ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলাম যে, ইহারা হয়তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়া এই সকল টাকা লইবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। ইহারা এখন এই জনশূন্য অরণ্য হইতে আমাকে খদে ফেলিয়া দিলে আর কেহই জানিতে পারিবেনা। এ কেবল আমার বৃথা আতঙ্ক। তাহারা জলপান করিয়া পুনর্ব্বার সবল হইয়া আমাকে একটা বাজারে লইয়া দুই প্রহর রাত্রিতে নামাইল। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আমার পকেটের কতকগুলা টাকা পয়সা বিছানাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেখি যে, সেই কুলিরা সব কুড়াইয়া আনিয়া আমাকে দিল। তাহাতে তাহাদের উপরে আমার বড়ই বিশ্বাস জন্মিল। আরি মধ্যাহ্নকালে ডগসাহীতে পঁহুছিলাম। তাহারা আমাকে একটা খোলার

ঘরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী সন্ধ্যার সময়ে আমার কাছে পঁহুছিল। খদের ধারে একটা গোয়ালার বাড়ীর উপরে একটা ভাঙ্গা ঘর থাকিবার জন্য পাইলাম এবং শয়নের জন্য একখানা দড়ির খাটিয়া পাইলাম। ইহাতেই সেই রাত্রি যাপন করিলাম। তাহার পর আমি সকালে উঠিয়া পর্ব্বতের চূড়াতে চলিয়া গেলাম। দেখি, সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যেরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তরয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম এবা আমার উপরে তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরখারা কি এখানে আসিতেছে?" আমি বলিলাম "না, এখন এখানে আসে নাই।" আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিলাম এবং খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র গুহা পাইলাম, তাহার মধ্যে ছায়াতে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাকালে নীচে পর্ব্বতে আসিয়া সেই গৃহে শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে অল্প বৃষ্টি হইল, আর সে ঘরের ঘরত্ব থাকিল

না। ভাঙ্গা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমার সেই বনবাসে দিনরাত্রি কাটিয়া যাইত। আমি এইরূপে অতি কষ্টে এগারোদিন অতিবাহিত করিলাম। এখন সংবাদ আইল যে, শিমলা নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে। আর কোন ভয় নাই। আমি শিমলা যাইবার উদ্যোগ করিলাম। কুলি আনিতে পাঠাইলাম, শুনিলাম কুলি নাই ওলউঠার ভয়ে তাহারা পলাইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গম পার্ব্বতীয় দেশে ভ্রমণ ও শিমলাতে প্রত্যাবর্ত্তন, কিয়দ্দিন পরে পুনরায় প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শনার্থে উচ্চপর্ব্বতে আরোহন এবং অতীব কৃচ্ছ্র সাধন।

সেই সিপাই বিদ্রোহের সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একা একা দুর্গম পার্ব্বতীয় পথে কখন ঝাঁপানে কখন ঘোড়ায় চড়িয়া অতীব সঙ্কটাপন্ন স্থান সকল অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে (কোথাও বা কিছু দিন বাস করত) কি ভাবে দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক বিবরণ আমরা তাঁহার আত্মজীবনীতে পাঠ করিয়া অবাক হই। ফলে/তাঁহার পর্য্যটন ও কঠোর তপস্যাসাধন প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে এই বোধ হয় যে তিনি অতীব ভয়াকীর্ণ স্থানে ভয় শূন্য হৃদয়ে দিন যাপন করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন কেবল মাত্র ব্রহ্মবলে। উপনিষদাদি শাস্ত্র অনুশীলনে ও তদনুযায়ী ব্রহ্ম-সাধনে তিনি যেরূপ আত্ম-জ্ঞান ও আত্মবল লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মৃত্যু ভয় এড়াইয়াছিলেন। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুং পরিব্যথা"॥ অর্থাৎ মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা না দিউক এজন্য সেই বেদ্য পুরুষকে জান। উপনিষদের এই শ্লোকের মর্ম্ম তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া অভয়স্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইয়াছিলেন; এবং কি ধর্ম্ম কি কর্ম্ম ক্ষেত্রে তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিত্য উপাসনায় স্বাধ্যায় সাধনে যে মন্ত্রটী আবর্ত্তণ করত আত্মস্থ করিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা তাঁহার জীবনে আমরা অবলোকন করিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করিতাম, সেই মন্ত্রটী এই ঃ—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য
মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো
বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।"

অর্থাৎ "মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

বহু বিঘ্নময় ও ভয়াবহ দেশ ও ঘটনা মধ্যে বিচরণ করিয়া শিমলায় প্রত্যাগত হইয়া কিয়দ্দিন পরেই তিনি আবার উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ ও পর্য্যটন করিতে বহির্গত হইলেন। প্রকৃতিতে ব্রহ্ম দর্শনের স্পৃহা তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে তিনি তাহা চরিতার্থ করিতে প্রাণ মন আত্মা সবই ব্রহ্মপদে সমর্পণ করত তাঁহারই সহ-বাস সুখ ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে একান্ত প্রয়াসী হইতেন ;—ব্রহ্মই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য প্রতি তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি ভয়শূন্য হইয়া চলিতেন ফিরিতেন। তিনি জানিতেন ঈশ্বরের ইচ্ছা মঙ্গলময়, তাহাই তাঁহার রক্ষক ও পরি-চালক। প্রাণযোগী ও কর্ম্মযোগীগণ তাহা জানিয়া জীবনপথে চলিতে আর ইতস্তত করেন

না। এইরূপ ক্ষেত্রে মহাযোগী পুরুষ St. Francis de sales মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

Would to God that we paid little attention to the condition of the Road which alarms us but kept our eyes steadily fixed upon Him who guides us and the happy end to which He leads us.

অর্থাৎ ঈশ্বর করুণ যেন আমরা পথের ভয়াবহ অবস্থার প্রতি মন না দেই, কেবল স্থির নেত্রে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য দৃঢ়তার সহিত নিবদ্ধ করিয়া রাখি, কেননা তিনি আমাদের পরিচালক—তিনিই আমাদিগকে আনন্দময় গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতেছেন।

সকল অবস্থাতে সকল কার্য্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিতেন। তাঁহার জীবনের কত কত ঘটনায় কত কত কার্য্য আমরা তাহা তাঁহার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া-দেখাইয়াছি। এতদ্বারা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পথের পথিক যাহারা তাহারা কত না সুশিক্ষা ও সৎসাহস

লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ ও অত্যন্ত দুর্গম স্থান সকলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মদর্শনে ব্যাকুল ভাব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা নিজে আর কি বলিব? যাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত আছে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"একটা ঘোড়া পাইলাম। সেই ঘোড়াতে বৈকালে সওয়ার হইয়া চলিলাম। খানিক দূর আসিয়া রাত্রিতে একটা আড্ডায় থাকিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আমি আবার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লাগিলাম। তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই প্রখর হইয়াছে। একটু ছায়ার জন্য আমি লালায়িত হইলাম, কিন্তু একটি বৃক্ষ নাই যে, আমাকে একটু ছায়া দেয়। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে আর একটি মানুষ নাই যে, একবার ঘোড়াটা ধরে। আমি সেই অবস্থায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত চলিয়া একটা বাঙ্গালা পাইলাম। ঘোড়াটিকে এক স্থানে বাঁধিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। একটু জল চাহিতেছি, দৈব ক্রমে পলায়িতা একটি বিবি সেখানে ছিলেন, তিনি

সমদুঃখে দুঃখী হইয়া আমার জন্য একটু মাখন ও তপ্ত আলু আর একটু জল পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা খাইয়া ক্ষুৎ-পিপাসা নিবাণর করিয়া প্রাণ ধারণ করিলাম। সন্ধ্যার সময়ে শিমলাতে পঁহুছিলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছি, কিশোরী, আছ এখানে? এখানে কি আছ? দেখি যে, কিশোরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি ডগসাহী হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে শিমলায় ফিরিয়া আইলাম।

আমি শিমলাতে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরী নাথ চাটুর্য্যেকে বলিলাম, আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত ভ্রমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক্ করিয়া রাখ। "যে আজ্ঞা", বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দিবস শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত বাঙ্গীবর্দ্দারেরা সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, তোমার ঘোড়া কোথায়? "এই এলো বোলে, এই এলো বলে", বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই।

আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব আর সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। ঝাঁপান উঠিল, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা বাঙ্গী লইয়া চলিল, হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আনন্দে, উৎসাহে বাজার দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্ব্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্ব্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমায় কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্ণিশ দিয়া একা একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি"। আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কার্ণিশের উপরে একটি মাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ানক গভীর খদ—ঈশ্বর প্রসাদে

আমি তাহা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর প্রসাদে যথার্থই "পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং" আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না। তথা হইতে ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্ব্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আইল। সোজা খাড়া পর্ব্বত, নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে ভয়ে এ সঙ্কট পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর একটা শূন্য পান্থ-শালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেই খানেই অবস্থিতি করিলাম। আমি সে দিন, সেই চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া, ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর ঝাঁপান চলে না।" এখন কি করি? পথটা চড়াইয়ের পথ, কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, ঊর্দ্ধের দিকে কেবল পাথরের ঢিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ সঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া

উঠিতে লাগিলাম—একজন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কৌচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটী দুগ্ধ আনিল; কিন্তু অতি পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুগ্ধ খাইতে পারিলাম না ”

সেই যে কৌচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল একবারও উঠিলাম না। প্রাতে শরীরে একটু বল আইল, ঝাঁপানীরা এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উচ্চ গিরি আরোহণ, নিবিড় বনে
প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য
এবং নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত
সুগন্ধময় পুষ্প দর্শনে
পরমানন্দ উপভোগ।

শিমলা হইতে নিকটস্থ উচ্চপর্ব্বত সমুহে এবং তদন্তর্গত নিবিড় বনে ভ্রমণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কত যে আনন্দ লাভ করিলেন তাহা বর্ণন করিতে গেলে প্রাচীন ঋষিদিগের বনপর্য্যটন-বর্ণিত শাস্ত্রীয় বিবরণ মনে পড়ে। মহর্ষি যেমন কত কত বিঘ্নময় স্থান দিয়া গমন করিয়া ক্লেশানুভব করিয়াছিলেন তেমনি আবার সুন্দর সুন্দর অরণ্যে "শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ সকল বর্ণেরই পুষ্প যথাতথা হইতে তাহার নয়নকে আকর্ষণ" করিয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রাণ পরিব্রাজকগণের যে অতুলনীয় আনন্দ তাহাই তাঁহার আত্মাতে উপস্থিত হইয়া কেমন এক স্বর্গীয়ভাবে তাঁহার প্রাণকে অভয়ের অবস্থায় স্থিত করিয়াছিল। ভগবানের করুণানুভবে তাঁহার মধুময় কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার আত্মজীবনীতে তদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। উহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আরো উপরে উঠিয়া সেইদিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে; তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে, অনেক তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক পথ চলিয়া

পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিত বর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেত-বর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্প ও গন্ধ দান করি-তেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফল সকল খণ্ড খণ্ড রক্ত-বর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে

দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই—আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কেবা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কেবা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে, তথাপি তিনি কতযত্নে, কতস্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! "তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।" হাফেজের উক্তি।

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুঙ্গ্রী নামক পর্ব্বত চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই শতদ্রু নদী তীরে রামপুর নামে যে এক নগর

আছে,তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ,যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহুপথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চ-বিংশতি বৎসর হইবে এবং ইংরাজী ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী শোহিনী হইয়া তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্ব্বতত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে। গতকল্য সুঙ্গ্রী হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্ণে নগরী নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা বেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেণময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দকরতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে। এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পর-পারে গিয়া একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকা ভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই।

এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে একজন মনুষ্য বাস করিতেছে সে তো ঘর নহে-সে পর্ব্বতের গহ্বর সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর একটি ছেলে পর্ব্বতের উপরে সঙ্কট স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তিসুখ দুর্ল্লভ। আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান" পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবানের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদী-তীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল এবং অন্ধ তিমির সেস্থান হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে

তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষ সকল দেখিয়াছি এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শিমলা শৈলে প্রত্যাবর্ত্তন, পার্ব্বতীয় দেশে ভ্রমণকালে শীত ও উষ্ম সহন। ভৃত্যের প্রতি আশ্চর্য্য ক্ষমা প্রদর্শন। "ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা" লাভে পরমাত্মার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ধর্ম্ম যাঁহার প্রাণ কর্ম্ম তাঁহার নিকট কখন কখন বিঘ্নময় ও কঠিন ভাব ধারণ করিলেও তাহা পরমাত্মা রূপ প্রাণভানুর উদয়ে তুষারের ন্যায় বিগলিত হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। মহাপ্রাণ মহর্ষির জীবনে আমরা তাহা কতবার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। মানবে যখন দেবভাবের সমাবেশ হয় তখন ভগবৎ লীলা নানা ভাবে প্রকাশিত

হইয়া ভক্তের জীবনে প্রকটিত হইয়া থাকে। সেই রূপ দর্শনে উপনিষদকার ঋষিরা উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন ঃ—

"আনন্দরূপম মৃতং যদ্বিভাতি!" এই কঠিন জড়বাদ এবং বিলাসপরায়ণতার কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধনাঢ্য ও বহু সুখময় ও বিলাসপূর্ণ ভবনে লালিত পালিত হইয়াও কেমন করিয়া যে এইরূপ দেবপ্রসাদ ও তপপ্রভাব লাভ করিলেন তাহা বলিবার সাধ্য মানবের আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা। মানবাত্মাকে এই তত্ত্ব দেবাত্মারাই বলিয়া দিতে পারেন। একথা সত্য যে মঙ্গলময় ঈশ্বর এইরূপেই জগতে দেবাদর্শ প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রকটন করিতেছেন। মহাপুরুষদিগের দেব জীবন তাঁহার ভবোদ্যানের ফুল স্বরূপ কত না সুশোভিত;—দেবেন্দ্র ঋষি সেই উদ্যানের একটী সুন্দর ফুল। ভারতবাসিগণ এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র সৌরভ বর্ত্তমানে পাইয়াছে। কালে ঐ ফুল যতই প্রস্ফুটিত ও সহস্রদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইবে ভারত তাহা অঙ্গুলি

নির্দ্দেশ করিয়া দর্শকগণকে দেখাইবে এবং ভারত সন্তানকে বলিবে "সন্তান! পরব্রহ্ম প্রদত্ত বিকশিত ফুলসহ ঐ ফুলটী বিষ্ণুপদে অর্পণ করত কি ধর্ম্ম কি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন ঋষিদিগের ধ্বনিত প্রাণপ্রদ মন্ত্র "তৎ বিষ্ণো পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ" জপ কর। তাহা হইলে মনে আনন্দ প্রাণে আরাম এবং আত্মায় শান্তি পাইবে। প্রায় তিন সপ্তাহ গিরি, গুহা, বন, উপবন, ভ্রমণ করিয়া মহর্ষি শিমলায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সকল বিবরণ তাহার দেবভাবাপন্ন বাণী সহ তাঁহার আত্মজীবনীতে প্রেম-পূর্ণ ভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ তাহা শ্রবণে প্রীত হইবেন আশায় আমরা তাহার সমস্তটাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"১৩ই আষাঢ়ে (১৭৮০ শক) ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমার শিমলার প্রবাসঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম। কিশোরী দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল! আমি বলিলাম, "তোমার মুখ যে একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।" সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না, যখন

আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি অনুশোচনাও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্ব্বত হইতে নামিয়া জ্বালামুখী চলিয়া গেলাম। জ্বালামুখীর অগ্নির তাপে, জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে। আমি আপনার নিকট বড় অপরাধী ও দোষী হইয়াছি। আমার আশা নাই যে, আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে তেমনি আমার কাছে থাক।" সে বলিল, আমি নীচে যাইবার সময় একটা চাকর বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি যে, সে চাকর পলাইয়া গিয়াছে। দরজা সব বন্ধ, আমি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের কাপড় ও বাক্স পেটরা সকলই আছে, কিছুই লইয়া যায় নাই। আমি তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছি। আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। যদি আমি তিন দিন পূর্ব্বে এখানে আসিতাম তবে বড়ই বিভ্রাটে

পড়িতে হইত। এই বিংশতি দিবসের পর্ব্বত ভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাস সুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেম গান করিতে লাগিলাম।

পৌষ মাঘ মাসের শীতেতে ও আমি গৃহে আগুণ জ্বালাইতে দিতাম না। শীত কতদূর শরীরে সহ্য হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, এবং তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার জন্য, আমি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। রাত্রিতে আমি আমার শয়নঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতাম; রাত্রির সেই শীতের বাতাস আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমি কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করিতাম—"যোগী জাগে—ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান, প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতীয় রাজা ভজ্জীর রাণার নিমন্ত্রণ রক্ষা। তান্ত্রিক ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ ও অস্বীকার। রাজকুমারের সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণ। শিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন।

অনন্ত যশ ধারী পরমেশ্বরের সুযশ যাঁহারা ঘোষণা করিয়া বেড়ান সেই যশের সৌরভে তাঁহারা সৌরভান্বিত হইয়া থাকেন। সেই সৌরভ মানবাত্মার নিকট চিরপরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কার্য্য তাঁহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি যে দেশেই যাইতেন তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমন্বিত জীবনের সুবাস চারিদিকে ছুটিত এবং তাঁহাকে মহাপুরুষরূপে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। তিনি কি রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও প্রেমে মিলিত হইতেন;

কিন্তু নিজের বিশেষত্ব ও বিশ্বাসের বল কখন এক বিন্দুও লাঘব করিয়া চলিতেন না। মানবাত্মার প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য উদারভাব ছিল। অন্যের প্রতি ব্যবহারে তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ভদ্রতা বড়ই প্রশংসনীয় ছিল। একারণ দর্শক মাত্রেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। যেখানে মত ভেদ হইত সেখানেও তিনি ধীর ভাবে সত্যের মহিমাকে মহিমান্বিত করিতেন *। এই হেতু তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। ভজ্জীর রাণার রাজ ভবনে মহর্ষির সত্যনিষ্ঠ ও মধুর ব্যবহার কতনা প্রীতিকর ও শিক্ষাপ্রদ। সে সম্বন্ধে তাঁহার কথিত কাহিনীর সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

* অনেক স্থলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবদ্দশায় এই ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে নিজের বাক্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত। কিন্তু ঐ জীবনী প্রকাশক পরলোকগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার পরিশিষ্টে তাহা বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহর্ষির শিষ্যগণের সহিত তাঁহার শান্তও ধীরভাব প্রদর্শন সম্বন্ধে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার উদারতা ও প্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

"মাঘ মাসের শেষে আমি বসিয়া ব্রহ্মচিন্তাতে মগ্ন, এমন সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত লোক আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দুই হাতে দেখি সোণার বালা। তিনি আমাকে বলিলেন, যে "আমি ভজ্জীর রাণার মন্ত্রী, উজীর। রাণা সাহেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, আপনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভজ্জি এখান হইতে অধিক দূর নয়, আর যাহাতে আপনার সেখানে যাইতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম। শতদ্রু নদীতীরে রাণার রাজধানী সোহিনী নগরী শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা সেখানে পঁহুছিলাম। পরদিন প্রাতঃ-কালে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলাম। তথাকার লোকেরা প্রথমেই আমাকে রাজগুরুর আশ্রমে লইয়া গেল। আশ্রম দ্বারে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই রাজগুরু সুখানন্দনাথ আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন।

আমি শিমলাতে আছি শুনিয়া ইনিই রাণাকে বলিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই আশা ছিল যে, আমাকে লইয়া পান ভোজনে তাহাদের একটা মহোৎসব হইবে। পরস্পর সদ্ভাব ও সুহৃদ্ভাবের বন্ধন

হইবে। তাঁহারা জানিতেন না যে, আমি মদ্যপানে বিরত এবং আমার মতে মদ্যপান ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। "মদ্য মদেয় মপেয় মগ্রাহ্যং" মদ্য কাহাকে দিবে না, মদ্য পান করিবে না, একবারে স্পর্শ করিবে না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে মদ্যপানে যোগদিতে না পারাতে তাঁহাদের সকল আমোদ ও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াগেল। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন এবং আমার আহারের পৃথক বন্দোবস্ত করিবার জন্য কিশোরীর উপর ভার দিলেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। একটা বড় দালানে চৌকী সাজান আছে, সভাসদ্‌গণ সহরাণা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে তাঁহার একটা চৌকীতে বসাইলেন এবং তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক চৌকীতে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণেক পরে কুমার সদৃশ রাজ-কুমার আসিয়া সভার শোভা করিয়া বসিলেন। রাণা সাহেব আমাকে বলিলেন যে "কুমার সংস্কৃত পড়্‌তে হৈ, আপ ইনকা কুছ পরীক্ষা লিজিয়ে।" ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "হাম্ সব ব্যাকরণ পড়লিয়া।" বলিলাম, কহতো "গঙ্গা উদকং" ইসকা সন্ধিমে ক্যা হোগা? তাড়াতাড়ি জোরে বলিল, "গঙ্গোদকং।" রাণার নিকট হইতে বাসায় আসিয়া আমি স্নানাহার করিলাম।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সিমলা পাহাড়ে বাসকালে নিকটস্থ বন উপবনে ভ্রমণ। একদা নদীতীরে পর্য্যটনে আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন ও স্বদেশে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বাণী প্রাণাভ্যন্তরে শ্রবণ এবং শিমলা শৈল ত্যাগ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ধর্ম্ম কি কর্ম্ম জীবনে সতত পরমাত্মার স্মরণ, মনন, চিন্তনে জাগ্রত থাকিতেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দৃশ্য দেখিতেন তাহা ধর্ম্মপ্রাণ সুধীগণই বোধগম্য করিতে সক্ষম। আমরা তাহা কি বুঝিব? এই ভাবিয়া সময়ে সময়ে যখন হতাশ হইয়া পড়ি তখন কে যেন আমাদের হৃদয় দ্বারে আসিয়া ঘা দেয় ও আমাদের অবসাদগ্রস্ত প্রাণকে জাগাইয়া তুলে। তাঁহার আত্মজীবনী অনুশীলনে আবার আমাদের

প্রাণে কতনা বলাধান হয়। তাহাতেই আমরা এই গ্রন্থখানির প্রণয়ন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। তাঁহার নিজের বর্ণিত কাহিনী এতই শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী যে আমরা আমাদের জ্ঞানগত বা চিন্তা প্রসূত কথাবার্ত্তা অভিব্যক্ত না করিয়া তাহাই পাঠকগণের প্রীতিরহেতু প্রকটিত করিয়া থাকি। এবারকার তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী দৈবভাবে পূর্ণ। তাহা তাঁহার আত্মজীবনীর অষ্টা-ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"একদিন আমি আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জন ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে,

তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবলবেগে ছুটিতেছে! কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্য্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী শুনিলাম "তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" আমি চমকিয়া উঠিলাম! তবে কি আমাকে এই পুণ্য-ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে?

আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লানভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই।

ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম—ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল, বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, কিশোরি! আমার আর শিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃদকম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম—ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়্ধড়ানি আর নাই—সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি তাঁহার হুকুম। "হুকুম অন্দর সব কোই, বাহার

হুকুম না কোই।” আর কি আমি সিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে “এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।” প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক আর সবলই হউক; আর কি আমি সিমলাতে থাকিতে পারি? তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম! আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। *নদী যেমন আপনার বেগ মুখে প্রস্তরের বাধা মানে* না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না। ১লা কার্ত্তিক বিজয়া দশমী, সিমলার বাজারে সদর রাস্তায় আমার ঝাঁপান, দোলা ও ঘোড়া সকলই প্রস্তুত। আমার চারিদিকে আমার স্বদেশীয় বন্ধুরা অতি দুঃখের সহিত আমাকে বিদায় দিলেন। আমি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঝাঁপানে চড়িয়া প্রস্থান করিলাম। বিজয়া দশমীতে আমার সিমলা হইতে বিসর্জ্জন হইল”।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শিমলা হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনকালীন সেপাই বিদ্রোহ হেতু পথে ভয়াবহ দৃশ্য ও ঘটনা-বলী। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিজ্ঞতার সহিত বিপদ হইতে উদ্ধার ও কর্ত্তব্য সাধন।

"সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই প্রবাদ-বাক্য আমরা স্থান বিশেষে কতবার উল্লেখ করিয়াছি। এবারও তাহাই বলিতেছি। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বরের কৃপা বা সহায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধু ইচ্ছাকে বারম্বার পূর্ণ করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মহাযোগী পুরুষ সেণ্টফ্রানসিস্ St Francis de sales মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এই ঃ—

"God has preserved you so far; only keep yourself faithful to the law of his Providence and He will assist you at all times, and where you cannot walk He will carry you."

ইহার ভাবার্থ এই যে "ঈশ্বর তোমাকে যখন এতদূর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তখন তিনি সর্ব্ব সময়েই তোমাকে রক্ষা করিবেন। কেবল চাই এই যে তুমি সেই বিধাতাপুরুষের বিধিতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া চল। তাহা হইলে হইবে এই যে যেখানে তুমি চলিতে অক্ষম হইবে সেখানে তিনি তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন।

শিমূলা হইতে কলিকাতা যাত্রা পথে এবার কি ভয়ানক দৃশ্য, কি অদ্ভুত ঘটনাবলীর কাহিনী শ্রবণ, কত কত বিঘ্ন উৎপত্তিতে মহর্ষির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুবিজ্ঞতার পরিচয় সম্বন্ধীয় বিবরণ আমরা অনুশীলন ও শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সেই ঘোরতর সিপাহি বিদ্রোহের সময় কৃপাময়

ঈশ্বর তাঁহার আশ্চর্য্য কল্যাণীয় নিয়মে তাঁহাকে নিরাপদে স্বগৃহে পঁহুছিয়া দিতেছেন। ইহার মধ্যে ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে ; তাহা জ্ঞান-জ্যোতি ও ভক্তি সহকারে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে সহজেই বোধ্য হয়। সে সম্বন্ধে আমরা তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া মহর্ষির ধর্ম্ম-জীবন গ্রন্থে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করি। আপাতত প্রাগুক্ত বিষয়ে তাহার আত্মজীবনীতে প্রকাশিত কাহিনীর সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম তাহাতেই পাঠকগণ আমাদের ঐ অভিব্যক্ত বিষয়ের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন।

"আম্বালায় আসিয়া ডাকের গাড়ী ভাড়া করিলাম এবং তাহাতে চড়িয়া দিন রাত্রি চলিতে লাগিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া রহিয়াছে, খোলা মাঠ হইতে শীতল বায়ু আসিতেছে। গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি যে, ঘোড়সওয়ার আমার গাড়ির পাশে পাশে ছুটিতেছে। বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গভর্ণমেণ্ট পথিক দিগের নিরাপদের জন্য গাড়ির সঙ্গে রাত্রিতে সওয়ার ছুটিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাতে পথের সঙ্কট

বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার মনে মনে কিছু শঙ্কা হইল। বেলা দুই প্রহরের সময় কাণপুরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে ঘোড়া বদলাইবার জন্য আমার গাড়ি থামিল, দেখি যে, সেখানে একটা মাঠে অনেক তাম্বু পড়িয়াছে, লোকের বিস্তর ভিড় এবং সেখানে একটা বাজার বসিয়াছে। কিছু খাদ্যের জন্য কিশোরীকে পাঠাইলাম, সে সেখান হইতে আমার জন্য মহিষের দুগ্ধ আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কিসের বাজার? বলিল, দীল্লির বাদ-শাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্য বাজার। শিমলাতে যাইবার সময়ে ইহাঁকেই যমুনার চরে সুখে ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আজি আসিবার সময়ে ইহাঁকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দী হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে তাহা কে বলিতে পারে? শিমলা হইতে বিপদসঙ্কুল অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কানপুরে উপস্থিত হইলাম। এখন এখান হইতে রেলপথ খুলিয়াছে। শুনিলাম প্রাতে ছয়টার সময়ে গাড়ি ছাড়িবে। আমি ভোরে উঠিয়া একটু চা পান করিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেষণে পঁহুছিলাম। সাতটা বাজিয়া গেল, কিশোরী ষ্টেষণ হইতে আসিয়া বলিল যে, "টিকিট পাওয়া যাইবে না। আজ গাড়িতে দীল্লির ফেরত

আঘাতী সৈন্যেরা যাইবে। অন্যের জন্য তাহাতে জায়গা নাই।" আমি নিজে অনুসন্ধানের জন্য ষ্টেষণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একজন বাঙ্গালী ষ্টেষণ মাষ্টার আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আপনি? ওরে গাড়ি থামা, থামা। আমি মনে করিয়াছিলাম আর কেউ?" সে বলিল, "আপনাকে আমি টিকিট দিতেছি এবং আমার ক্ষমতা আছে আমি গাড়ি থামাইয়া আপনাকে উঠাইয়া দিতে পারিব। আমি আপনার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পুরাতন ছাত্র। পরীক্ষায় আমাকে কতবার পুরস্কার দিয়াছেন, আমার নাম দীননাথ।" সে আমাকে টিকিট দিল, আমি কাপ্তান সাহেবদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া কানপুর ছাড়িলাম। বেলা তিনটার সময়ে এলাহাবাদে পঁহুছিলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এলাহাবাদ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবার কালে সেপাই বিদ্রোহহেতু নানাবিঘ্ন, প্রতিবন্ধক ও তাহার প্রতিকার।

এই স্থলে মহর্ষির কর্ম্মজ্ঞান, কর্ম্মবুদ্ধি ও কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। গীতায় (দ্বিতীয় অধ্যায় ৫০ শ্লোকে) আছে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। কর্ম্ম যোগীরা জানেন "কর্ম্ম কৌশল" কাহাকে বলে। এই কৌশল বলেই মহর্ষি ঐ ঘোরতর দুঃসময়ে বিঘ্ন হইতে উদ্ধার ও জাহাজে পূর্ব্বাভিমুখে গমনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আত্ম জীবনীতে বর্ণিত কাহিনী বড়ই চমৎকার ও শিক্ষাপ্রদ বলিয়া তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"আমি তাহার পরদিনে দেখিলাম যে, এলাহাবাদের রাস্তায় গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে

"যিনি আরো পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতে চাহিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবনের জন্য দায়ী হইবেন না।" এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমার মন বড়ই উৎক্ষিপ্ত হইল। শুনিলাম, তখনো দানাপুরে কুমার সিংহের লড়াই চলিতেছে। মনে করিলাম, ডাঙ্গাপথে যাইতে যদি এত বিপদ, জল পথেও কি যাইবার সুবিধা নাই? এই ভাবিতে ভাবিতে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিলাম। বেড়াইতে গিয়া দেখি যে একটা ষ্টীমারে ধুমা উড়িতেছে, সে তখন ছাড়ে ছাড়ে। আমি দৌড়াদৌড়ি গিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ষ্টীমার কোথায় যাইবে? সে বলিল, "একটা ষ্টীমার কিছু দূরে মাঝ গঙ্গায় চড়ায় ঠেকিয়া রহিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য এখন এ ষ্টীমার যাইতেছে, এখানে ফিরিয়া আসিয়া তিনদিন পরে এ কলিকাতায় যাইবে।" তখন আমি তাহার একটা ঘরভাড়া করিবার জন্য আগ্রহ জানাইলাম। সে বলিল, "রুগ্ন ও আহত সৈনিক পুরুষ-দিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য এ ষ্টীমার গবর্ণমেণ্ট ভাড়া করিয়াছেন, পথিকদিগের জন্য ইহার ঘর মিলিবে না। তবে যদি তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে এক হুকুম আনিতে পার, তবে আমি তোমাকে ইহাতে লইতে পারি।" আমি তাহার এই উপদেশ অনুসারে

খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ব্রিগেডিয়ারের কার্য্যালয়ে একটা মস্ত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। তখন ব্রিগেডিয়ার অন্য কাজে বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমাকে পরদিন সকালে আসিতে বলিলেন। সকাল বলিতে প্রভাতে কিম্বা বেলা দশটার সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রভাতেই তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বসিয়া বসিয়া দশটা বাজিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার আফিসেই আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনিও বলিলেন যে, "এ ষ্টীমারে সৈনিক পুরুষেরা যাইবে, তাহাদের সহিত তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ভিন্ন ইহাতে আর কেহ স্থান পাইতে পারে না।" আমি বলিলাম, যখন গভর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে ডাঙ্গা পথে যাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং জলপথে গভর্ণমেণ্টের লোকদের সঙ্গে নিরাপদে যাইবার আমার সুযোগ হইতেছে, তখন তুমি আমাকে যাইতে দিবে না কেন? ব্রিগেডিয়ার মনে করিরয়াছিলেন যে, আমি বিদ্রোহীদলের কেহ হইব। আমার এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিমলাতে লর্ড হে প্রভৃতির সঙ্গে আমার আলাপ আছে জানাইয়া তাঁহাকে আমার সকল পরিচয় দিলাম। তখন তিনি

একটা ক্যাবিন আমাকে ভাড়া দিবার জন্য ষ্টীমারের কাপ্তানকে চিঠী দিলেন। ইতিমধ্যে সেই ষ্টীমার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমি যাইয়া কাপ্তানকে ব্রিগেডিয়ারের চিঠী দিলাম। কিন্তু এখন কাপ্তান বলিলেন যে, "এ চিঠীতে কি হইবে ? ষ্টীমারের ক্যাবিন তো খালি নাই, তোমাকে ক্যাবিন কি করিয়া দিব ?" আমি বলিলাম, যদি ক্যাবিন নাই তো আমি ডেকেই যাইব ; তুমি ক্যাবিনের ভাড়া লও ও আমাকে ষ্টীমারের ডেকে যাইতে দাও। সে বলিল, "তুমি তোমার জিনিস পত্র লইয়া আইস, আমি ইতিমধ্যে তোমার জন্য ক্যাবিন পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি।" তখন আমি তাহার কথাতে আহ্লাদিত হইয়া দৌড়াদৌড়ি লাল কুঠিতে গিয়া আমার সকল দ্রব্যাদি আনিলাম। আমার চির সুহৃৎ নীল কমল মিত্র আমার পথের খাওয়ার জন্য এক ঝুড়ি মিঠাই সন্দেশ দিলেন, তাহাতে আমার বড়ই উপকার হইয়াছিল। শীঘ্রই ষ্টীমার কলিকাতাভিমুখে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কাশীতে পঁহুছিয়াই একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কাপ্তান এক টেলিগ্রাফ পাইলেন যে, এ কার্গো—বোটের জন্য দ্বিতীয় ষ্টীমার আসিতেছে, তাহাকে অন্য কার্গো বোট আনিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কাপ্তান এই

টেলিগ্রাফ পাইয়া অস্থির হইল, সে বলিতে লাগিল, "আমি আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না, গভর্ণমেণ্টের হুকুমের কিছুই ঠিকানা নাই। এতটা পথ আসিয়া আবার আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ বড় অন্যায়।" কাপ্তানের বাড়ী যাইবার জন্য মনে ব্যগ্রতা ছিল, এদিকে ষ্টীমার কার্গো বোটকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলে ষ্টীমারের সাহেব বিবিদিগেরও ফিরিয়া যাইতে হইবে, অতএব সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এ টেলিগ্রাফে কিছু এমন বলিতেছে না যে, এইখানেই কার্গো-বোট রাখিয়া ষ্টীমার চলিয়া যাইবে। যেখানে আগন্তুক ষ্টীমারের সহিত তাহার দেখা হইবে, সেইখানে তাহাকে কার্গো-বোট দিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। হয়তো তাহার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই এ ষ্টীমার কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে। সাহেবদিগের এইরূপ পরামর্শে কাপ্তান সম্মত হইয়া ষ্টীমার কলিকাতার দিকে ছাড়িলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদ হইতে ষ্টীমার যোগে কলিকাতা গমন কালে বহু বিঘ্ন হইতে উত্তরণ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে চলিতে চলিতে জাহাজের খোলে পতিত হইতে হইতে আশ্চর্য্য ভাবে আত্মরক্ষা।

যে সকল দুর্ঘটনার মধ্যে পতিত হইয়া মহর্ষি তাঁহার অশেষ ধৈর্য্য ও অতীব শুভ বুদ্ধি সহকারে সেই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া জাহাজে কলিকাতার দিকে চলিলেন তাহা পাঠ করিলে লোমাঞ্চ হয়। বস্তুতঃ জীবনের নানা পরীক্ষা সম্ভূত দুঃখ, যন্ত্রণা, ক্লেশের কশাঘাতে প্রাণ জর্জ্জরিত না হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মানবের প্রতি স্নেহ মমতা ভালবাসা এ সকল প্রকৃত পক্ষে অবগত হওয়া যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কি ধর্ম্ম

কি কর্ম্ম জীবন তাহারই সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মহাত্মা “সেণ্টফ্রানসিস্ ডি, সেল (St Francis de Sales) মহাশয় কি চমৎকার কথাই বলিয়াছেন ঃ—

“How can we know frank, ardent love but in the midst of thorns, crosses, weariness, above all, when this weariness is prolonged”

তিনি আবার বলিয়াছেন ঃ—

Here is a great lesson ; we must discover God's will and recognizing it we must endeavour to do it joyfully and at least courageously.

এই প্রকার ভাবেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনকে, দেবপ্রসাদে ও আত্ম-প্রভাবে, সংগঠিত করিয়াছিলেন। “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” তপস্যা ক্ষেত্রের এই যে বীজ মন্ত্র তাহা তিনি প্রকৃষ্ট ভাবে সাধন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেশ পর্য্যটন, প্রকৃতিতে

ব্রহ্ম দর্শন এবং তাঁহার জীবনে বিবিধ কর্ম্মের আয়োজন প্রয়োজন সম্বন্ধীয় বিধাতার বিধান বর্ণন করা সহজ কার্য্য নহে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে ও ধারণাতে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহা আমরা সাধ্যানুসারে লিপিবদ্ধ করিতেছি। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালীন শেষ বৃত্তান্ত যাহা তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমি এই ষ্টীমারে যাইতে পথে এক সংবাদ পত্রে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথের মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। এই সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে অন্যমনস্ক হইয়া একটা কি দ্রব্য আনিবার জন্য ডেক হইতে ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম এবং সেই দ্রব্য লইয়া তাড়াতাড়ি যেই ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি, আমার পা আর প্রতিষ্ঠা-ভূমি পাইল না। আমি আচম্বিতে দ্বিতীয় পা না বাড়াইয়া পৃষ্ঠের দিকে একটা ঝোঁক দিয়া ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। খালাসীরা "হাঁ, হাঁ" করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেখে যে, আমার এক পা খোলের মধ্যে ঝুলিতেছে ও আমার সমস্ত শরীরটা ক্যাবিনের মধ্যে

পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা বলিল, "জিনিস তুলিবার জন্য এই ক্যাবিনের সম্মুখের রাস্তার পাটা সকল উঠাইয়া ফেলিয়া ছিলাম, আপনি কি তাহা দেখেন নাই?" আমি তো তাহা দেখি নাই, আমি জানি যে, পূর্ব্বের মত সে রাস্তা ঠিকই আছে। আমি যদি দ্বিতীয় পা বাড়াইতাম, তবে পঞ্চাশ হাত নীচে খোলের মধ্যে পড়িয়া আমার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। সে দিনকার জন্য তো আমার প্রাণ বাঁচিল। "কিন্তু সংসারের ডাকাত ঘুমায় নাই, তাহা হইতে নির্ভয় হইও না—যদি আজ সে না নিয়া যায়,কা'ল সে নিয়া যাবে।" (হাফেজের উক্তি)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামপুর বোয়ালিয়া পঁহুছিয়া পুনরায় ষ্টীমার সম্বন্ধে কষ্ট উপস্থিত, ষ্টীমার বদল। পরে কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছন।

দুই বৎসর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার আবাসে পঁহুছিয়া পরিজনবর্গ, বন্ধুগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত করিলেন। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে জাহাজে কলিকাতায় প্রত্যাগমন বিবরণ তিনি যাহা আত্ম-জীবনীতে বর্ণন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"রামপুর বোয়ালিয়াতে পঁহুছিতে পঁহুছিতে দেখি যে, ধূমা উড়াইতে উড়াইতে একটা ষ্টীমার আসিতেছে। তাহা দেখিয়া কাপ্তান আমাদের ষ্টীমার থামাইলেন। আগন্তুক ষ্টীমার তাহার কাছে আসিয়া থামিল এবং সেইখানেই দুই ষ্টীমার নোঙ্গড় ফেলাইয়া রহিল। সাহেব বিবিরা এ ষ্টীমারে

যাইয়া দেখিলেন যে, সে ষ্টীমার খানি ছোট, এবং তাহার ঘর সংখ্যায় অতি অল্প, ইহাতে তাঁহাদের সকলের সঙ্কুলান হইবে না। সাহেবেরা ডেকে থাকিয়াও একপ্রকারে কাটাইতে পারেন, কিন্তু বিবিরা কোথা থাকিবেন? কার্গো বোটে মিলিটারী সার্জন প্রভৃতি যে সকল সাহেবেরা ছিলেন, কাপ্তেন তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মিলিটারী সার্জন কিছু স্পষ্টবাদী, তিনি বলিলেন "এমন কতবার আমি বিবিদের সন্তোষার্থে ক্যাবিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্য একটা থ্যাঙ্কও পাই নাই।" কার্গোবোটের ক্যাবিনের অধিকারী সাহেবেরা কেহই বিবিদের জন্য তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে কাপ্তান আমার কাছে আসিয়া নম্রভাবে অনুরোধ করিলেন, "বিবিদের থাকিবার আর স্থানের সঙ্কুলান হইতেছে না, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ক্যাবিনটা ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা বড় বাধ্য হন।" আমি অতি আহ্লাদের সহিত আমার ক্যাবিন তাঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিলাম। কাপ্তান ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ইংরাজেরা বিবিদের স্বদেশীয় হইয়াও তাহাদের একটু স্থান দিলেন না, আপনি কেমন উদারভাবে তাঁহাদের জন্য আপনার ক্যাবিন ছাড়িয়া দিলেন, ইহাতে আমরা

সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।” ক্যাবিন ছাড়াতে আমার নিজের কিছু কষ্ট হইল না। যাহাতে আমি ডেকে আরামে থাকি তাহার জন্য কাপ্তানেরা সকলে মিলিয়া সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি সেই ডেকের মুক্ত বায়ুতে রাত্রিতে সুখে শয়ন করিলাম। রামপুরে ষ্টীমার বদল ও বন্দোবস্ত করিতে কিছু বিলম্ব হইবে, অতএব আমার আসিবার সংবাদ দিবার জন্য আমি কিশোরীকে একটা ডিঙ্গি করিয়া আগেই বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম তাহার পর দিনই ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ আমি নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। তখন আমার বয়স ৪১ বৎসর।”

কলিকাতায় পঁহুছিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিয়া পরম ব্রহ্মভক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে প্রার্থনা প্রসূত যে সঙ্গীত করিয়াছিলেন তাহা এই ঃ—

“কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।
নিশিদিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে কত যে তোমার
করুণা।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় বিবিধ মহৎকার্য্যের সংসাধনে উদ্যম ও উৎসাহ প্রদর্শন এবং দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মপ্রচার।

১৭৭৮ শকের আশ্বিন মাসে কলিকাতার ভবন হইতে যাত্রা করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা, লাহোর, অমৃতসর, শিমলা ও তদন্তর্গত বহু বহু পর্ব্বত ও পার্ব্বতীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ মাসে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই দুই বৎসর তাঁহার অবিশ্রান্ত পর্য্যটন, প্রকৃতির দৃশ্য দর্শন এবং নানা বিঘ্ন বিপদে পতিত হইয়া তাহা হইতে উত্তরণ প্রভৃতি কার্য্য ও ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহার কর্ম্মজীবনে কৃচ্ছ্র সাধন ও তপস্যার অবধি ছিল না। এইরূপ তপস্যাসম্ভূত তাঁহার যে আত্মবল সঞ্চার

তাহার কার্য্য জগতকে দেখাইবার জন্যই জগৎপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে স্বদেশে (বঙ্গে) আনয়ন করিয়াছিলেন। দেব প্রসাদ ও তপঃপ্রভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪১ বৎসর বয়সের পর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে যে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার "ধর্ম্ম জীবন" গ্রন্থে বলিবার আমাদের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন।

"শিমলাতে সিপাহিবিদ্রোহের উপদ্রব সহ্য করিয়া, উচ্চতর উত্তরহিমাদ্রি পরিভ্রমণ করিয়া এবং নির্জ্জন শিলাতলে ব্রহ্মসাধন করিয়া যখন প্রকৃতির অঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে পাইলেন তখন ১৭৮০ শকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পর্ব্বতের নির্ম্মল নির্ঝরের বারি পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য নিম্নগামিনী হয়। মহর্ষি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আপ-

নাকে সংসারের কর্দ্দমে মলিন করিয়াও বিশেষরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং নয় বৎসরকাল দৃঢ় পদে ব্রাহ্ম সমাজক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাণপণে তদ্ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

এই ৯ বৎসর মহর্ষির কার্য্যাবলী (ধর্ম্ম ও কর্ম্ম) সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী ও তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত আছে। আর তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে জনশ্রুতিতে এবং পরলোকগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রমুখাৎ ও মহর্ষির আত্ম জীবনীর পরিশিষ্টে লিখিত যে সকল বিবরণ আমরা অবগত হইয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের লেখনী পরিচালনা করিতে যতদূর পারি তাহাতে ক্রুটী হইবে না। ধর্ম্ম সমন্বিত তাঁহার কর্ম্মজীবনের বৃত্তান্ত অতি ব্যাপক। তাহা যথাযথ ভাবে বিবৃত করা সুকঠিন হইলেও আমাদিগের প্রয়াস এই যে যতই মহর্ষির জীবনের কাহিনী বলিতে পারি ততই যেন আমাদের কর্ত্তব্য সাধনক্ষেত্রে কেমন একটা আনন্দানুভব করি, কেন না, মহর্ষি দেবের পবিত্র ও নিষ্কাম কর্ম্ম বর্ণন করিতে ও

পুণ্যের বায়ু বহিয়া আমাদের দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাতে বলাধান করে। এই লোভেই আমরা তাঁহার জীবন কাহিনী বর্ণনে, এত অযোগ্য হইয়াও, তাহাতে উৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইয়া থাকি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গে নানা শুভ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার অবস্থায়
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সমাচার অবগত
হইয়া সাহায্য দানার্থে দেশের লোকের
নিকট দান প্রাপ্তির জন্য জ্বলন্ত
উপদেশ প্রদান ও ঈশ্বরের
নিকট প্রার্থনা।

১৭৮২ শক—পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহার সমাচার শ্রবণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি এই উপলক্ষে ঐ শকের ১২ই চৈত্র রবিবারে ব্রাহ্ম সমাজে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করিলেন তারপর যে "জ্বলন্ত উপদেশ দান করিয়া ছিলেন তাহাতে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইয়া "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" ভাবে ধন ও কতই দ্রব্য দান করিয়া ছিলেন। সেই বক্তৃতার শেষাংশ এই ঃ—

"দেখ! ধর্ম্ম কি বলে, দয়া কি বলে, কৃতজ্ঞতা কি বলে; সকলি বলিতেছে, তোমরা ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্তে হস্ত প্রসারণ কর। আমরা যৎকিঞ্চিৎ দিব বৈ নয়, আমরা যদি সর্ব্বস্ব জীবিকা প্রদান করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইতে পারে? আমাদের মধ্যে ধনেতে, মানেতে, সকলেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমারদের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরের পূজার নিমিত্তে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রেয়স্কামেতে আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমারদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির যে দান, তাহা ব্রাহ্মসমাজের দান নহে। অন্যেরা অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অন্যেরা নামের জন্য দেয়, অন্যেরা না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে সাহায্য করে; আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক, প্রীতির সহিত, ঈশ্বরের কার্য্য জানিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করিতেছি! আমারদের দানে যদি একবেলার জন্য একজনেরো ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমারদের সাধু ইচ্ছাই সর্ব্বস্ব। এস আমরা সকলে এমন দৃষ্টান্ত দেখাই যে আর সহস্র লোকে তাহার অনুগামী হয়। কৃপণতা, ক্ষুদ্রভাব, পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাব ধারণ

কর। ঈশ্বরের সেই উদার মঙ্গল ভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তাঁর বৃষ্টি আসিয়া কেমন সমুদয় পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিতেছে। সেই বৃষ্টি এক বৎসর আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে। যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমারদের দয়া গিয়া কি তথায় এক বৎসরেরও কার্য্য করিতে পারিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু, মেঘ হইতেও অপদার্থ? এই বৃষ্টি সূর্য্য যাঁহার কার্য্য করিতেছে, আমরা কি তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিব? যাঁহার বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, যাঁহার সূর্য্য-কিরণে রক্ষিত হইতেছি, যাঁহার বৃষ্টিতে অপর্য্যাপ্ত অন্ন-পান পাইতেছি; তাঁর কার্য্য কি সমুদয় যত্নের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিবে না? আমারদের প্রতি তাঁর অজস্র দান; আমরা যথাসাধ্য তাঁহাকে দান করিয়া তাহার অল্প মাত্রাও পরি-শোধ করিতে পারি, এ অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে। যদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ। এই বিষয়ে ইংরাজেরা কত সাহায্য করিতেছে। দুই তিন বৎসর হইল, সেই পশ্চিমের লোকেরা তাহারদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের বাস-গৃহ জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহারদের স্ত্রী-পুত্রদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সে শোণিত এখনো শীতল হয় নাই। কি

মহত্ত্ব! তাহারা সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সেই সকল লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা অসৎকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজয় করিতেছে; শত্রুতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে। তাহাদের তুলনায় আমারদের কি হীনতাই প্রকাশ পায়। আমারদের মধ্যে ধনী, মানী, উচ্চপদের লোকেরা, তাহারদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহারদের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়; কিন্তু তাহারা আমোদ কোলাহলেই মত্ত—পরদুঃখে কিঞ্চিৎ মাত্রও কাতর নহে। বিদেশীয়েরা নিঃস্বার্থ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারদের দুঃসময়ের বন্ধু হইয়াছে, আর আমরা তাহাদের দুঃখে দৃক্‌পাতও করিতেছি না। ব্রাহ্মেরা যেন এই সাধারণ দোষে দোষী না হন। তাঁহারদের দৃষ্টান্তে যেন আর সকল লোকে অগ্রসর হইয়া এই মহৎকার্য্যে সহায়বান্ হন্।

আমরা সকলে দীন-দরিদ্র—ধনী মানী আমারদের মধ্যে অতি অল্প। ঈশ্বর ধন-সম্পত্তি দেখেন না; তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন। তিনি আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মূল্য বিবেচনা করেন। ঈশ্বরের নিকটে ধনী মানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি

অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্র ভাব দেখেন, যে আপনি দুই দিবস উপবাস করিয়া একজন ক্ষুধার্ত্তকে এক বেলার অন্ন দেয়, তিনি তাহার উদার ভাব দেখেন। নিঃস্বার্থ সাধুর হৃদয়েই তিনি বিমল আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। এস সকলে মিলিয়া আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে দান করি। হৃদয়কে প্রীতি ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করি; আমারদের যেন কোন নীচ লক্ষ্য না থাকে, আমারদের সাধ্যের যেন ত্রুটি না হয়। মুক্ত হস্তে প্রশস্ত হৃদয়ে, যে যাহা পারি, তাহা তাঁহার চরণে অর্পণ করি।” এই বক্তৃতার পরে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে ২২৭৩৶১০ টাকা সংগৃহীত ও ৬০০৲ শত টাকারও অধিক মুল্যের নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্রব্যের নিদর্শন মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারিবেন যে কোন কোন স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের অলঙ্কার পর্য্যন্তও তাহাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং কাহারও কাহারও ইচ্ছানুরূপ ধন দান করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল উদার ভাবে দান করিয়াছেন।

দ্রব্যের নিদর্শন।

১। ফিরোজা রঙের রুমাল ১ খানা। ২। সবুজ

রঙের রুমাল ২ খানা। ৩। লাল ১ খানা। ৪। চিকনের ১ খানা। ৫। জরদ রঙের ১ জোড়া। ৬। লাল রঙের ১ জোড়া। ৭। শাদা রুমাল ১। ৮। টুপী ১০টা। ৯। ৪গজ কালো রঙের আলপাকা। ১০। আনা রসি কাপড়ের কাবা ১টা। ১১। হীরার অঙ্গুরী ১টা। ১২। ফিরোজার অঙ্গুরী ১টা। ১৩। স্বর্ণ অঙ্গুরী ২টা। ১৪। ১ ছড়া সোণার গোট। ১৫। ঘড়ির শিকলি ১ ছড়া। ১৬। ঝুমকা ১ জোড়া ও পাসা ১ জোড়া। ১৭। বালা ভাঙ্গা সোণা। ১৮। সোণার বাজু ২ খানা। ১৯। বোঁদা ২টা। ২০। টুকরা সোণা। ২১। রুপার থালা ১ খানা। ২২। রুপার আতর—দান ১টা গোলাপ পাস ১টা এবং ফুলদান ১টা। ২৩। রুপার বিছা ১ ছড়া ও বকলস ২টা। ২৪। রুপার ছালনা ১০ টা। ২৫। রুপার গোটের থামি ১ খানা। ২৬। রুপার মল ১ জোড়া ২৭। রুপার কাঁটা ২টা। ২৮। রুপার মল ১ জোড়া। ২৯। রুপার শিকলি ১ ছড়া ও চুটকী ২টা। ৩০। রুপার চিরুণি ২খানা। ৩১। পিতলের ঘড়া ১টা। ৩২। পিতলের থালা ৩ খানা। ৩৩। কোমর বন্ধ ১টা। ৩৪। গরদের ধুতি ১ খানা। ৩৫। লাংক্লথ ২ গজ। ৩৬। কাগজের ট্রে ২টা। ৩৭। বালাম চাউল ২ মোণ।”

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার মূল মন্ত্র "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" সেইরূপ উপাসনার ভাব এস্থলে পূর্ণ মাত্রায় দেখা গেল।

উপাসনার পরই তৎক্ষণাৎ "শ্রদ্ধেয়া দেয়ম্" ভাবে ভগবদ্ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে এইরূপ দানকার্য্যের দৃশ্য অতি বিরল, সে দৃশ্য হৃদয়-স্পর্শী, তাহা পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ফলে ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে যখন যে সাধু ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য সাধনের ভাব উদয় হইয়াছিল ভগবান তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন এই দেখিয়া আমরা পুনরায় আনন্দসহকারে বলিতেছি যে "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবদাদিষ্ট ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনে তৎপর থাকিয়া স্বদেশে বিদেশে এবং সমুদ্রপথে ভ্রমণাদির মনোহর ও ভয়ঙ্কর বিবরণ বর্ণন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মপ্রচার ও নানাবিধ শুভকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কাশ্মীর রাজ্যে গমন করিয়া তদন্তর্গত বৃহৎ সরোবরে নৌকাযোগে ও ফলফুলে পরিশোভিত অরণ্যে পদ-ব্রজে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর মহর্ষি ধর্ম্মশালা, কুল্লু প্রভৃতি পর্ব্বত, উপত্যকা, নগর, প্রান্তর, ও নদী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ধর্ম্মশালাতে (ডালহৌসি পর্ব্বতাঞ্চলে) একাদিক্রমে ৪।৫ বৎসর বাস করিয়া ছিলেন। মহর্ষির কাশ্মীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বড়ই হৃদয়স্পর্শী, তাহা

তাঁহার আত্ম জীবনীর পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহর্ষি কাশ্মীর রাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা মানসবুল নামক একটি সরোবর তীরে উপস্থিত হন। এই সরোবরটি এত বড় যে পার হইতে নৌকাতে দেড়ঘণ্টা সময় লাগে। এই গোলাকার সরোবরের জলরাশিকে বেষ্টন করিয়া শালের পাড়ের ন্যায় তাহার কূল হইতে জলেরদিকে দশহাত দূর পর্য্যন্ত পত্রের উপরে ভাসমান রক্ত পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা করিতেছে। ইহার তীরে একটি মুসলমান ফকিরের আশ্রম ও উদ্যান আছে। এই উদ্যানই তাহার উপজীবিকার হেতু। তাহার সঙ্গে মহর্ষির এখানে সাক্ষাৎ হয়। সে তাঁহাকে উদ্যান জাত বহুবিধ ফল দিয়া সমাদর করে এবং অনেক গল্প করে। বলে যে, "আমি সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানই ভাল লাগে নাই। এই আমার মনের মত স্থান, তাই এখানে বাস করিতেছি। এই স্থানেই আমি মরিব।" এই বলিয়া মহর্ষিকে লইয়া গিয়া একটি গর্ত্ত দেখাইয়া বলিল, "আমার নিজের কবর আমি নিজেই নির্ম্মাণ করিতেছি। আমি রোজ ইহা হইতে দুই কোদাল করিয়া মৃত্তিকা উঠাইয়া থাকি। ইহাতে আমার রোজ মৃত্যুকে স্মরণ হয়।"

চিনদেশে গমন। ও তথাকার দৃশ্য বর্ণন।

চীনদেশে গমন কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়াছিলেন। হংকং পঁহুছিয়া তথা হইতে ক্যাণ্টনে যাইয়া সেখানকার ধর্ম্ম-মন্দির প্রভৃতি দর্শন ও মন্দিরস্থ ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়াছিলেন তথাকার দৃশ্য বর্ণনা এই ঃ—

"এখানে পাপীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগের বিবিধ মৃৎমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। কোথাও ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র মনুষ্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিতেছে, কোথাও বা কেহ কৃমি কীট দ্বারা অর্দ্ধ-ভক্ষিত দেহে ছটফট করিতেছে, কেহ অগ্নিতে দগ্ধ, কেহ বা বিষে জর্জ্জরিত। অন্য কতবিধ ভয়ঙ্কর দৃশ্য রহিয়াছে তাহা দেখিলে মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হয়।"

লঙ্কাদ্বীপে গমন। ব্রহ্মদেশে পর্য্যটন।

লঙ্কাদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ কালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ তথাকার বৌদ্ধ যাজকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন।

সকল দেশের ধর্ম্মমন্দির দর্শন ও ধর্ম্মযাজক সহিত ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে প্রবল স্পৃহা, তাহা তিনি আশ্চর্য্যভাবে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি আবার আসাম প্রদেশেও পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গে নৌকা-যোগে নদীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত তাঁহার আত্মজীবনীতে পাঠ এবং সুধী-জন মুখে যথেষ্ট শ্রবণ করিয়াছি। সুদীর্ঘ বহু ব্যাপক বলিয়া এখানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল না। তাঁহার কর্ম্মজীবনে স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ ও প্রকৃতির শোভা দর্শন সম্বন্ধীয় বিবরণ সকল বড়ই মনোহর। বিশুদ্ধ ও উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে দেশ দেশান্তর পরিব্রজন করা একান্ত প্রয়োজনীয় মহর্ষির জীবন তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহানুষ্ঠান কার্য্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও পরিচালন শক্তির সুন্দর পরিচয়।

গৃহ্য সংস্কার অর্থাৎ গৃহ কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদুপদেশ দান ও পরিচালন শক্তি কত যে প্রসংশনীয় তাহা তাঁহার আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা অত্যন্ত প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয় বোধে আমরা নিম্নে সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"* * *——র বিবাহক্রিয়া যাহার যাহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে বিষয়ে——কে এক পত্র লিখিয়াছি; তাহার প্রতিলিপি পাঠ করিয়া আপনি জানিতে পারিবেন। সেই প্রতিলিপি এই পত্র মধ্যে পাঠাইতেছি।——আচার্য্য ও পুরোহিত উভয়েরই কার্য্য সমাধা করিবেন, তাহা হইলে * * ব্রাহ্মেরাও বিবাহে আসিয়া যোগ দিতে পারিবেন। অবস্থা ও সময়ের গতিকে চলিয়াও যাহাতে ধর্ম্মের হানি না

হয়, তাহাতে সাবধান হইতে, হইবে। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, বিবাহের পূর্ব্ব দিনে আমাদের দালানে,——কে লইয়া পদ্ধতির বিধান মত তাঁহার যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিবেন। তথায় দুইটি পিড়ি ও আসন আনাইয়া তাহার উপরে পুরোহিতকে ও বরকে যেখানে যেমন বসিতে হইবে তাহা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়কেও দেখাইয়া দিবেন। তিনি বর কন্যার বসিবার ধারা ও পরিবর্ত্তন আপনার উপদেশ মত মনে ধারণ করিয়া রাখিবেন। এবং বিবাহের সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ব্রজেন্দ্রনাথ রায়কে বলিয়া দিবেন যে স্ত্রী-আচারের সময়ে তিনি অন্তঃপুরে থাকিয়া দেখিবেন, যেন সেখানে গ্রন্থি বন্ধন না হয়। তিনি আরো দেখিবেন যে,——ও——অথবা ইহাদের দুই জনের মধ্যে একজন স্ত্রী-আচারের পর যেন বর কন্যাকে সঙ্গে করিয়া দালানে লইয়া আইসে এবং গ্রন্থি বন্ধন পর্য্যন্ত কন্যার নিকট বসিয়া থাকে, যেহেতু ইহাদের দ্বারা গ্রন্থিবন্ধন হইবে ব্রজেন্দ্র তাহাতে সাহায্য করিবেন।

ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া সমুদায় বিবাহ পদ্ধতি—"অমুক, অমুকী" "স্বামীগোত্র" মাস, পক্ষ, তিথি, গোত্র, প্রবর, নাম প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাগজে, ৩।৪ খানা ছাপাইবেন।

তাহার একখানা——র হস্তে থাকিবে, আর একখানা——র হস্তে থাকিবে। তিনি তাঁহার নিকট বসিয়া দেখিতে থাকিবেন, যদি——র কোন ভুল হয়, তিনি শুদ্ধ করিয়া দিবেন। আর এক খানা আমার নিকটে বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পাঠাইয়া দিতে যত্ন করিবেন,——বা——কলিকাতায় পঁহুছিলেই তাঁহার নিকট হইতে তাঁহাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম ও গোত্র প্রভৃতি জানিয়া লইবেন।"

উপরোল্লিখিত প্রতিলিপি পত্র।

——র বিবাহের লগ্ন ৫ই মাঘ সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময় ধার্য্য করিলাম, তোমার প্রতি ভার দিলাম, তুমি প্রণিধানপূর্ব্বক যথাবিধি এই শুভ বিবাহ সম্পাদন করিবে। তুমি আচার্য্য ও পুরোহিতের উভয় কার্য্য সমাধা করিবে। তুমি প্রথমে সম্প্রদাতা ও জামাতার নিকটবর্ত্তী আসন লইয়া মন্ত্র পড়াইয়া সম্প্রদাতার দ্বারা জামাতাকে যথাবিধি বরণ করাইবে। স্ত্রী-আচারের পর বর কন্যা সম্প্রদানশালায় বিবাহ সভাতে উপস্থিত হইলে তুমি——ও——কে সঙ্গে লইয়া বেদীতে আরোহন করিবে এবং উভয়কে তোমার উভয় পার্শ্বে বসাইয়া স্বয়ং আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিবে। তুমি শান্ত, সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান পদ্ধতির বিধানানুসারে ব্রহ্মোপাসনা

করিবে। তাহার কোন অংশ পরিত্যাগ করিবেনা। তাহার মধ্যে যাহা সংস্কৃত পাঠ, তাহাতে——ও——তোমার সহিত যোগদিবে, বাঙ্গালা অংশ তুমি একাকী পাঠ করিবে। উপাসনা শেষ হইলে বেদীতে——ও——বসিয়া থাকিবে, তুমি তাহা হইতে নামিয়া নীচে তোমার পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিবে এবং পদ্ধতি অনুসারে বরকে ও কন্যাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মন্ত্র সকল পড়াইবে। সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে আবার তুমি বেদীর মধ্যস্থলে বসিয়া বরবধূকে পদ্ধতি লিখিত উপদেশ দিবে, তাহাতে যেন গম্ভীরতা রক্ষা হয় ও তাহা হৃদয়ে লাগে। উপদেশ দিয়া নীচে নামিয়া যথাক্রমে মন্ত্র পড়াইয়া বরবধূকে সপ্তপদী গমন করাইবে। বিনা প্রমাদে আমার এই সকল উপদেশ পালন করিবে—যেহেতু ইহাতে ত্রুটী হইলে বিবাহ বৈধ ও সিদ্ধ হইবে না। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিবে—"

সর্ব্ব মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা তাঁহার জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মীসাধককে তাঁহার বিশ্ব রচনার অন্তর্গত শুভদায়ক কর্ম্মের সুসম্পাদনে যখন নিয়োজিত করেন তখন তাহাদের দ্বারা যে কোন কার্য্য সম্পন্ন হউক তাহা প্রায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে

দৃষ্টিগোচর হয়। মঙ্গলাধার বিশ্বপতি পূর্ণ-পুরুষ। এই হেতু তিনি স্বয়ংই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। তাঁহার ভক্ত সাধকদিগকে কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে তিনিই যথা-বিধি শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তাই যথানুরূপ তাহার কার্য্য সুসিদ্ধ হয় অর্থাৎ তাহার জীবন ও কার্য্য সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে ভূষিত হয়। যাহারা সাধু মহাত্মাদের জীবনের কার্য্যে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তাহারা এইরূপক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি ও প্রেমে স্নেহের ও দয়ার বিকাশ দেখিয়া অব:ক হয়েন। আর কর্ম্মজগতে যে ভগবান কর্ত্তৃক শুভ বুদ্ধি দান এবং তাঁহার অহরহ স্বক্রিয়ভাবের প্রকাশ তাহাও তাহারা দেখিয়া আনন্দাপ্লুত হইয়া থাকে। তাই তাহারা জাগ্রত থাকিয়া শুভ কর্ম্মপরায়ণ হন ও ভগবৎ সেবার কার্য্যে আপনাকে সতত নিযুক্ত করিয়া রাখেন। মহর্ষির জীবন ও কর্ম্ম তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। এইরূপ আদর্শ জীবন কীর্ত্তন করিতেও প্রাণে কতনা আনন্দের উদয় হয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন।

১৭৬১ শকে আশ্বিন মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন। তিনি এই সভা সংস্থাপন করিয়া বঙ্গদেশের ও ভাষার উন্নতিকল্পে বিস্তর হিতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভাষাক্ষেত্রে যাহা আজকাল সাধুভাষা বলিয়া খ্যাত তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতেই উন্নত হইতে উন্নতকার ধারণ করিয়াছে। পরলোকগত সাহিত্য সেবী অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক থাকা কালে রচনা ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয়। সে সময় অনেক ভাল ভাল লেখক ঐ পত্রিকায় লিখিতেন এবং অনেকানেক শাস্ত্রবিৎ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি বেদ বেদান্ত ও বিবিধ শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত

করিয়া তাহা বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করত ঐ পত্রিকার মর্য্যাদা এতাধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন যে অনেক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহা পাঠ করিয়া বড়ই পুলকিত হইতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বয়স এক্ষণে প্রায় ৮০ বৎসর হইল। বঙ্গে যত মাসিক বা সাময়িক পত্র এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার জননী স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এখনও বিদ্যমানা রহিয়াছেন। এই পত্রিকার কন্যা দৌহিত্রী ও প্রদৌহিত্রী অনেক জন্মিয়াছে; এবং বঙ্গে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাবে তাহাদের অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধা তত্ত্ববোধিনী আজও জীবিত থাকিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বামাবোধিনী পত্রিকাও বৃদ্ধাবস্থায় পড়িয়াছে বলিতে হইবেক। তাহার বয়স এক্ষণে প্রায় ৫৫ বৎসর হইতে চলিল। সাধু পুরুষের হস্তের জিনিষ যে দীর্ঘজীবী হয় তত্ত্ববোধিনী ও বামাবোধিনী পত্রিকাদ্বয় তাহার দৃষ্টান্ত।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ পত্রিকার সুলেখক ও পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। সে সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গসাহিত্য মহলে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। এখনও ঐ পত্রিকার বিস্তর চিন্তাশীল সুলেখক ও লেখিকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনেক সন্তান সন্ততি জন্মিলে প্রাচীনার সেবা ও মর্য্যাদা বঙ্গে সচরাচর কম হইয়া আসে, তত্ত্ববোধিনীর ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়াছে। কালে জ্ঞান ও কর্ম্মের আধিক্য ও ভক্তির লাঘব হইলেই যে এইরূপ ঘটে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ফলে এ লক্ষণটা ভাল নহে!

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহার কার্য্যাবলী পাঠ করিলে চিত্ত বড়ই পুলকিত হয়। মহর্ষির আত্ম জীবনীর পরিশিষ্টে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তাহা সুদীর্ঘ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বোলপুর শান্তিনিকেতন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অজস্র দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া পরে ভগবৎ ইচ্ছা ও আদেশ পালনে স্বদেশে (বঙ্গে) প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে বহুতর শুভকর্ম্ম সম্পাদন করেন। এই সময়ে একটা সাধন আশ্রম নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হয় ; এবং তজ্জন্য তিনি স্থান অন্বেষণ করেন। ইহা হইতেই শান্তিনিকেতনের সূত্রপাত। পরে তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত (লুপ লাইনের ধারে) রেলওয়ে ষ্টেশনের আন্দাজ এক ক্রোশ দূরে মহাপ্রান্তর মধ্যে একটী উদ্যান ও তন্মধ্যে এক সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ উদ্যানে অনেক প্রকার ফল ফুলের বৃক্ষ রোপণ করেন। যথাকালে সেইখানে শান্তিনিকেতন সংস্থাপিত হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষ ও মহৎকীর্ত্তি ঐ শান্তিনিকেতন স্থাপন। তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি উহা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি উহার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী অতি পরিপাটী কাচের মন্দির তথায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা ও সাধারণ শিক্ষা দানার্থে তিনি তথায় একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ ও ব্যয় বিধানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় আমলকী বৃক্ষ বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে "হস্তামলকবৎ" দর্শন করিয়া আমলকী বৃক্ষের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ঋষিবর দেবেন্দ্রনাথ তদনুকরণে শান্তিনিকেতনের দ্বারদেশ হইতে তাহার প্রাসাদের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত উহা রোপণ করিয়াছিলেন। সেই সকল আমলকী বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া ঐ নিকেতনের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে; তাহা দেখিতে

বড় সুন্দর। ইহা ব্যতীত শান্তিনিকেতনের বৃহৎ উদ্যানে অনেকপ্রকার ফল ও ফুলের বৃক্ষ তাহার শোভা কতনা বর্দ্ধিত করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে পশ্চিম উত্তর কোণে বৃদ্ধ ছাতিম তরু অধিক আদরণীয়। যেন সেখানকার বৃক্ষরাজীর সভায় ঐ ছাতিম বৃক্ষ সভাপতিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার আদরটা ভগবান্ স্বয়ংই বাড়াইয়াছেন।

যখন শান্তিনিকেতনের সূচনা হয় নাই, তখন ঐ ছাতিম বৃক্ষতলে ডাকাতেরা মানুষ মারিত। মহর্ষি-দেব ঐ মুলুকে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানটিতে একান্তে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার আত্মার অভ্যন্তরে কি যে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন অথবা ভগবৎ আদেশে কিরূপ আদিষ্ট হইয়া-ছিলেন তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে কাহাকে বলিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁহার এক শিষ্যকে দীক্ষা দিবার সময় তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা স্থলে "শান্ত-স্বরূপ ও শিব-স্বরূপ" সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই উক্ত বিষয়ের তত্ত্বটা মূলতঃ কিঞ্চিৎ প্রকাশ

পাইয়াছিল। তাহা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জগতে এক অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা। মহর্ষির ধর্ম্ম জীবনে তাহা বর্ণনা যোগ্য। একারণ তাহা তাঁহার কর্ম্ম জীবনে বর্ণিত হইল না।

মহর্ষি উক্ত স্থানটী উপযোগী বোধে সেখানে উদ্যান ও একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া ঐ ছাতিমতলে ব্রহ্মসাধন করিতেন। শ্বেত মর্ম্মর পাথরের এক বেদী ঐ ছাতিম তলায় স্থাপিত করিয়া তাহারই উপর উপবেশন করত উপাসনা ধ্যান ধারণা করিতেন। পূর্ব্বে যেখানে ডাকাতে নরহত্যা করিত, সেখানে আজ "শান্তং শিবমদ্বৈতং" মন্ত্র মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত দেখিয়া সাধকগণের প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছাতিম বৃক্ষের তলে বেদীর নিকট কয়েকটি স্তম্ভে বেদ উপনিষদের মন্ত্র লিখিত আছে। ছাতিমের গায়ে পীতবর্ণে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে ঃ— "কর তাঁর নাম গান"। উহা ছাতিম 'বৃক্ষের অঙ্গস্থ হইয়া গিয়াছে ; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন তাহা তাহার দেহ হইতে আপনা আপনি ফুটিয়া বাহির

হইয়াছে। তাহারই নিম্নে বেদীর সন্নিকটে আর এক সাদা মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে মহর্ষি দেবের প্রাণের কথা অঙ্কিত আছে যথা ঃ—

"তিনি আমার প্রাণের আরাম"।

"তিনি আমার মনের আনন্দ"।

"তিনি আমার আত্মার শান্তি"।

বৃদ্ধ মহীরুহ ছাতিম শান্তিনিকেতনের উদ্যানে বড়ই প্রীতির বস্তু। উহা দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হয়, ঐ প্রাচীন তরু যেন বাল্মীকি মুনির ন্যায় ঐ স্থানটিকে তপোবনে পরিণত করিয়া বক্ষে প্রাণারামকে ধারণ করত জগৎবাসিগণকে বলিতেছে "মানবাত্মা শরীর মনের অধীনতা বশতঃ প্রত্যবায়ে পতিত হইয়া যত কেন কর্ম্মফল ভোগ করুক না 'পরমাত্মা চির দিনই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া জীবে তাঁহার অপার করুণা প্রদর্শন করিতেছেন।"

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দির অতি পরিপাটী রূপে নির্ম্মিত। উহাতে মহর্ষি দেবের স্থপতি-বিদ্যা

ও কারুকার্য্য-পারদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উহার চিত্রণ (নক্সা) অনুশীলন করিলে দেখা যায়, গৃহ ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবের সৌন্দর্য্য বোধ কেমন সুন্দর ছিল। তাহা মন্দির গঠনে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্দিরটী বিবিধ প্রকার লৌহ ঢালাই (castnigs) ফ্রেম্‌ সহিত বহুবিধ রঙ্গের ও ফুলকাটা কাচের দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার পূর্ব্বভাগে রথাকৃতি এক উচ্চ মঞ্চ—যাহার চূড়ায় ওঁ এবং চতুষ্পার্শে বেদমন্ত্র উন্মুক্ত আকাশে বিরাজ করিতেছে। মহর্ষির আত্মার উদার ও উচ্চভাব তাহা জাজ্জ্বল্যভাবে প্রকাশ করিতেছে।

বৎসর বৎসর ৭ই পৌষ মহর্ষিদেবের দীক্ষার সাংবৎসরিক উৎসবে তথায় বিশেষভাবে ব্রহ্মো-পাসনা হইয়া থাকে। উৎসব ক্ষেত্রে ভজন, ভোজন ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে একটি মেলাও হইয়া থাকে। তাহাতে ভৌতিক আতোষ বাজিতে,

আধ্যাত্মিক মন্ত্রের বিকাশে, অগ্নির সহিত ভারতের বেদবেদান্ত ধর্ম্মের যে চিরখেলা তাহাও ঐ ক্ষেত্রে নবাকারে প্রদর্শন করিবার জন্য মহর্ষিদেব তাহার আকার প্রকার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা চিরদিনই আগুণের বড় পক্ষপাতী।

মহর্ষি পুত্র সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি ছাত্রদিগের প্রতি যত্ন, ও তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হেতু বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উপস্থিত প্রায় দুইশত ছাত্র উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি এই তিন ভাষায় ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয়। ছাত্রদিগের শ্রেণী শান্তি-নিকেতনের বৃক্ষতলে অল্পাধিক দূরে দূরে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এক একজন শিক্ষক এক একটি শ্রেণীর ভার লইয়া বৃক্ষের ছায়াতলে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। এই দৃশ্য দেখিতে অতি মনোহর। স্বয়ং সার রবীন্দ্রনাথ একটি শ্রেণীতে

ঐ ভাবে পড়াইয়া থাকেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রাচীন সময়ের গুরুকুলশিক্ষালয় সদৃশ পাঠশালা। বর্ত্তমান সময়ের অর্থকরী বিদ্যালয়ের ন্যায় সেখানে কোনরূপ আড়ম্বর নাই। সহজ সরল এবং সাত্ত্বিকভাবের শিক্ষা ঐ ব্রহ্মবিদ্যালয় দান করিয়া থাকেন। সেখানে ছাত্রদিগের জন্য ব্যায়াম ও খেলা ধুলা করিবার জন্য প্রশস্ত ময়দানে সুবন্দোবস্ত আছে। ছাত্রদের সরল ও প্রফুল্ল ভাব দেখিলে মনে হয় ভারতে যেরূপ শিক্ষাক্ষেত্র হওয়া চাই তাহারই আদর্শ ভগবৎ কৃপায় ভারতবর্ষে দুইটী স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী হরিদ্বারের নিকট "কাঙ্গেরী" নামক স্থানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য মহাত্মা মুন্সীরাম "গুরুকুল" নামে স্থাপন করিয়াছেন, অপরটী "বোলপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়"। ভারতের পুণ্য ফলেই এযুগে এরূপ বিদ্যালয় তাহার বক্ষে বিরাজমান রহিয়াছে তজ্জন্য ভারতের ধর্ম্ম পালক পরমেশ্বরকেই ধন্যবাদ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দয়া ও দাতব্য।

পরার্থ-পরতা, উদারতা ও দাতব্য ইত্যাদি পুণ্যময় কার্য্যের সমাবেশে হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরার্থ-পরতা, উদারতা ও দাতব্য ভাব তাঁহার নিগূঢ় প্রেমেরই পরিচয়। তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন তাঁহার আন্তরিক ব্রহ্ম সেবার ভাব হইতেই উদ্ভূত। এই তত্ত্বটা গীতাতে পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হয় যথা "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" (গীতা ৩।১৫)

মহর্ষির দান কার্য্যের কত যে উচ্চ দৃষ্টান্ত আছে তাহা বলিয়া শেষ হয় না। তাহার মধ্যে কএকটী বড়ই হৃদয়স্পর্শী বলিয়া নিম্নে প্রকটিত হইল।

মহর্ষির আত্ম-জীবনীর প্রকাশক স্বর্গগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ জীবনীর পরিশিষ্টে একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"একদিন দেখি যে, কলিকাতা হইতে ৬০০০, ছয় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগচ আনাইয়া মহর্ষি আমার হস্তে দিলেন। বলিলেন যে, "এই টাকা এখানকার ব্যাঙ্কে তুমি মজুত করিয়া রাখ, যদি এখানে আমার শরীরের অবসান হয় ও সে মৃত শরীর লইয়া তুমি বিপদে পতিত হও তখন এই অর্থের দ্বারা সাহায্য পাইবে।" কয়েক দিন পরে আমি সেই টাকার কাগচ ব্যাঙ্কে রাখিতে যাইতেছি, বলিলেন, "কিছুদিন পরে রাখিও।" কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিব? বলিলেন, "আর কয়েক দিন পরে দিও।"

"একদিন দেখি যে, এক ডাণ্ডিতে চড়িয়া একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ। আসিয়া মহর্ষির পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "আমি যে তাড়িৎ বিদ্যা দ্বারা চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি এবং তাহার প্রচার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণার্থে যে ব্যয় হইয়াছে

তাহাতে সমধিক ঋণে জড়িত হইয়াছি। এক্ষণে আমার বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইতে চলিল। যদি আপনি আমাকে এই ঋণজাল হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা পড়িবে।" তাঁহাকে স্নানাহার করিতে অনুমতি করিয়া মহর্ষি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন "শাস্ত্রী! সীতানাথ বড় কষ্টে পড়িয়াছে। তোমার নিকটে যে কোম্পানীর কাগচগুলি আছে তাহা উহাকে দিলে ভাল হয়। তুমিই হস্তে করিয়া দিও ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে। বৈকালে সীতানাথকে নিকটে ডাকিলেন এবং কাগচের পৃষ্ঠে এক এক করিয়া দানের অনুমতি লিখিয়া আমার হাতে দিতে লাগিলেন আমি তাহা সীতানাথ বাবুর হস্তে দিতে লাগিলাম। দান শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন যে, "তুমি ইহা কাহাকেও বলিও না।" সীতানাথ তাহা স্বীকার করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাভরে পরদিন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সীতানাথ পাইলেন আট হাজার টাকা, যে হেতু এই ছয় হাজার টাকার কাগচের দুই হাজার টাকা সুদ পাওনা ছিল।"

যে কোন ব্যক্তি শুভাভিপ্রায়ে মহর্ষির নিকট দানপ্রাপ্তির আশায় যাইত সে কখন নিরাশ হইয়া

ফিরিয়া যাইত না বরং আশাতিরিক্ত দান প্রাপ্ত হইয়া অবাক হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন কালে ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যখন দান সংগৃহীত হইতেছিল তখন স্বর্গগত মহামান্য আনন্দ-মোহন বসু এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উভয়ে মহর্ষির নিকট উপস্থিত হন। তখন মহর্ষিদেব মোঃ বোলপুর প্রান্তরে একটি উদ্যান ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নির্জ্জন বাস করিতে-ছিলেন। ঐ দুই আগন্তুক হঠাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে সাদরে উপরে লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। পরে তিনি উক্ত ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া তাহার জন্য যতটুকু ভূমির দরকার তাহার মূল্য নিরূপণ করত ৭০০০ হাজার টাকার এক চেক্ Cheque তাহা-দিগকে প্রদান করিলেন। বসু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের আশা ছিল তাঁহারা হদ্দ এক হাজার টাকা দান প্রাপ্ত হইবেন; সে স্থলে সাত হাজার টাকা দান

পাইলেন। তাঁহারা মহর্ষির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে সকলে তাহা শ্রবণে বড়ই পুলকিত হইল।

বহুদিন হইল যখন আমরা গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করিতেছিলাম, কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত জনৈক গ্রামস্থ ভদ্র সন্তান বলিলেন, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম্মভাব দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।" এই বলিয়া তিনি উক্ত ঠাকুরের এক সত্য জীবন কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ দেশস্থ ঠাকুরদের জমিদারী হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ পদব্রজে কলিকাতায় আসিয়া ধূলি পদে তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কোথায় সেই ধার্ম্মিক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার সহিত আমি একবার দেখা করিতে চাই"। পরে তাঁহার সহিত উক্ত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "এ কেমন ধারা ব্যবহার! আপনকার জমিদারী কাছারির নায়েব আমাকে অক্ষম দেখিয়াও আমার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে জোর জবর-

দস্তি করিয়া থাকে। শুনিয়াছি আপনি ধার্ম্মিক পুরুষ, তাই স্বয়ং সমস্ত পথটা হাটিয়া এখানে আসিলাম। আমাকে সময় না দিলে বাকী খাজানার টাকাটা পরিশোধ করিতে পারিব না"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ ব্রাহ্মণকে প্রিয় সম্ভাষণে নিকটে বসাইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "তা হবে, কোন ভাবনা চিন্তা করিবেন না, অগ্রে স্নান আহার করিয়া সুস্থ হন।" ব্রাহ্মণ স্নান আহারান্তে পুনরায় তাঁহার জমিদার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে ঠাকুর মহাশয় সদাশয় চিত্তে বলিলেন, "খাজনার টাকাটা নায়েবকে ফেলে দিলেই যখন গোলমাল চুকিয়া যায় তখন আর কি? লউন এই টাকা, ইহা আমি আপনাকে দিলাম, আপনি ইহা নায়েবকে দিয়া দিলেই হইবে"। তখন ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া রহিলেন। পরে তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় বলিলেন "হাঁ, ধার্ম্মিক বটে,—যা শুনেছিলাম তাই বটে"! ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ঐ টাকা লইয়া তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যা-

গমন করিলেন। পরে তিনি জমিদারী কাছারিতে গিয়া বাকী খাজনাটা একেবারে চুকাইয়া দিলেন। এই সমাচার সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে এবং ক্রমে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আশ্চর্য্য দাতব্য কার্য্য" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

একদা তিনি অমৃতসহরে অবস্থিতিকালে বসন্ত-কালে ঐ সহরের একটি ফল ফুলে সুশোভিত বাগানে গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া একান্তে ফল-ভরে অবনত কতকগুলি বৃক্ষের সম্মুখে হাফেজের গজল্ (কবিতা) গাহিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। সেই একটী গজলের অর্থ এই "হে ঈশ্বর বসন্তের সমাগমে ফল ফুলে শোভিত এমন যে শোভনীয় বৃক্ষরাজী, ইহাদিগকে প্রলয়ে (ফনাতে) লইয়া যাইও না।" এই গজল ভক্তিভরে গাহিতেছিলেন ও নৃত্য করিতেছিলেন। এমন সময় দেখেন তাঁহার পিছনে একজন মুসলমান নিঃশব্দে নৃত্য করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি একজন

গরীব। আমি দেওয়ান হাফেজের ঐ গজল জানি, তাই আপনাকে তাহা গাহিতে ও গাহিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া আমিও নৃত্য করিতেছিলাম।” মহর্ষি তাহা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাহাকে বাসায় লইয়া যাইয়া তাঁহার বাক্সতে যে কয়টী খরচের টাকা ছিল, তাহা সমস্তই তাহাকে দিলেন। সে প্রীত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। মহর্ষির প্রেমের আদর্শ বড়ই উচ্চ ও বড়ই প্রাণস্পর্শী। ঈশ্বরের প্রেমই তাঁহার কি ধর্ম্ম কি কর্ম্ম জীবনের নিয়ামক ছিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম্ম ও কর্ম্মে বিবিধ শুভকার্য্যে ২২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। যে জীবন ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিতে আলোকিত এবং ব্রহ্মপ্রেমের আকর্ষণে জীবের প্রতি দয়াতে আপ্লুত সে জীবন দাতব্য বা দান কার্য্যে যে এত উদার এত মহাভাবাপন্ন হইবে তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেই মহাপুরুষদিগের জন্ম হয়।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদারি কার্য্য।

বিষয় জ্ঞানে প্রবীণতা ও জমিদারি কার্য্যে নিপুণতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদারের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর পৈত্রিক জমিদারির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। সেই ভার তিনি প্রবীণতাসহ বহন করিয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ পটুতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পিতৃঋণ পরিশোধার্থে জমিদারি সম্বন্ধে তিনি যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। তাঁহার বৃহৎ জমিদারি মহলের কার্য্যভার পাওনা-দারেরা তাঁহাদিগের হস্তে লইয়া পরে তাহা বহনে

অক্ষম এবং জমিদারি মহলের কর্ম্মচারিদিগকে পরিচালনে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের দেনাদার দেবেন্দ্রনাথের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন "আপনি জমিদারির খাজানা পত্র আদায় করিয়া আমাদের প্রাপ্য টাকা ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করুন।" তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে পর তিনি তাহা স্বহস্তে লইয়া উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করতঃ তাহার কার্য্যাদি সুনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তদ্দারা পিতৃঋণের অবশিষ্ট টাকা সমস্তই যথাসময়ে পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময় বিষয়ক্ষেত্রে ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে বিচরণকরতঃ তিনি একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহা যাহা বা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন তাহাতে কেহ যে সায় দেয় এমন এক ব্যক্তিকেও তখন তিনি তাঁহার আত্মীয় বন্ধু কাহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন না। পক্ষান্তরে পরিজনদিগের অনেকের নিকট হইতে তিনি তীব্র মন্তব্য ও নির্য্যাতন পাইয়া তাহা সহিষ্ণুতা সহকারে সহ্য ও উপেক্ষা

করিয়া চলিতেন। মহর্ষির যেমন ত্যাগ স্বীকার করা অভ্যাস ছিল তেমনি তিনি কুশলপ্রিয় ছিলেন।

জমিদারি বিষয় বিত্ত লইয়া যেমন বঙ্গদেশে হাঙ্গাম হুজ্জত ও মামলা মোকদ্দমা প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে ঠাকুরদিগের জমিদারিতেও তাহা কম ছিল না। বরং সময়ে সময়ে তাহা ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিত এবং তাঁহাদিগের নিন্দাবাদও শুনা যাইত। প্রজাদের অসঙ্গত আচরণ এবং পদ্মার চর লইয়া অন্যান্য জমিদারদিগের সহিত কলহ তাহার প্রধান কারণ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশ বিদেশ ভ্রমণে ও হিমাচলে ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল অবস্থানে স্বয়ং সেই সকল জমিদারি কার্য্য ও তৎসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ দেখিতে বা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ যাহা করিত তাহাই প্রায় হইত, যদিচ স্বদেশ ও বিদেশ হইতে তিনি তাহাদিগকে সদুপদেশ দান করিতে ক্রুটী

না। যাহাতে জমিদারির কার্য্যাদি কুশলে চলে তজ্জন্য তিনি মনোযোগ করিতে ক্রুটী করিতেন না। জমিদারের কর্ম্মচারিরা স্বভাবত কি ধাতুর জীব, এবং মামলা মোকদ্দমার জন্য নিজেদের বাহাদুরি বুদ্ধির পরিচালনা তাহারা কীদৃশভাবে করিয়া থাকে তাহা বঙ্গে কাহারও অবিদিত নাই। একারণ জমিদারদিগকে কখন কখন বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাও জানা কথা।

সচরাচর দেখা যায় বাঙ্গালী বাবুরা চাকুরী ও ব্যবহারাজীবীর কার্য্যেই পটু আর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-শ্রেণীর লোক অধিকাংশ কৃষিকার্য্য করে। তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যের জ্ঞান বুদ্ধি যেমন রাখেনা জমিদারি কার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোথায় কোন দোষ গুণ তাহা অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না। পরন্তু না বুঝিয়া নগরবাসী এ দেশীয় সমাচার পত্রের সম্পাদকগণের ন্যায় তাহারা হঠকারিতা সহ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে তৎপর। এ সম্বন্ধে তাহাদের কর্ম্ম বিবেক যে কোথায় তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই

না। ফলে আমরা অনেক অবুঝ লোকের পাল্লায় পড়িয়া বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের অনেকানেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে প্রাগুক্ত বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া "অবুঝকে বুঝান দায়" এই ভাবিয়া কখন কখন মৌন থাকিতাম, কখন বা প্রশ্নকারিদিগকে তাহাদিগের প্রশ্নের উপর এইরূপ প্রশ্ন করিতাম, যে "তোমরা কি জমিদার ?" তোমরা কি জমিদার বংশীয় ? "তোমরা কি জমিদারি কার্য্যে ব্যুৎপত্তি রাখ ?" অথবা তোমরা কি জমিদারিকার্য্য হাতে হেতেরে করিয়া দেখিয়াছ ?" জমিদার ও প্রজাদের যথার্থ কর্ত্তব্য কি ?—তাহার অবান্তর ঘটিলে কি ফল ফলে ? এ সকল কি অনুশীলন বা অভ্যস্তভাবে অবধারণ করিয়া দেখিয়াছ ?" তখন তাহাদের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যাইত "না !"—"জানি না !" আবার কেহ কেহ বলিত সে সকল করিয়া দেখিবার যোগাযোগ হয় নাই !" পাঠকগণ এখন প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝুন ব্যাপারটা কি ? না জেনে শুনে বঙ্গদেশ

লোকেরা স্বেচ্ছাসম্ভূত মন্তব্য প্রকাশ ও অনেক প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়া ফেলে।

এস্থলে একটা প্রধান কথা এই যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন এক কোটি টাকা পিতৃ ঋণ পরিশোধার্থে সত্য ও সততার প্রতি নির্ভর এবং তাঁহার একান্ত ধর্ম্ম জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং একারণ অশেষ ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছিলেন, তখন জমিদারি বিষয়কর্ম্মক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার করিবেন এরূপ কখন সম্ভব হয়? পরমেশ্বর তাঁহাকে তাঁহার পিতৃঋণ হইতে আশ্চর্য্যভাবে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পৈত্রিক জমিদারি সমূহ শোধিত খাঁটী স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভগবানের ইচ্ছা কে বুঝিবে বল? মহর্ষি পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া পরে জমিদারির আয় হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জনিত বহু বহু শুভকর্ম্মে ও দান কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। এমন যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা তিনি কি হিমালয়ের যোগাসন হইতে অবতরণ করিয়া

পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে "রাইয়ত ঠেঙ্গাইতে" কিম্বা প্রজাপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? এই সকল অসম্ভব "আজগুবী" কথা তুর্ব্বল ও কর্ম্মবিবেকহীন ব্যক্তিদিগের মুখেই শোভা পায় কিন্তু যে সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিবেক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা বাঙ্গালীদের ঐরূপ বালোচিত ভাষা শ্রবণে হাস্য করিয়া থাকেন।

জমিদারের কর্ম্মচারিগণ যে স্বভাবতঃ প্রজা-পীড়ক হইয়া থাকে তাহা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। ফলে তাহাদের কুস্বভাবের দোষে অনেক সময় তাহাদের মনিব জমিদারদিগের নিন্দা ও বদনাম হইয়া থাকে। রাজকার্য্যক্ষেত্রে এটা কিছু নূতন কথা নহে, তথাপি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ তাঁহার জমিদারির কর্ম্মচারিদিগকে ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মী প্রস্তুত করিতে ত্রুটী করিতেন না। মহর্ষিকে একবার একজন গুণজ্ঞ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "মহাশয়, আপনার জমিদারি কাছারির

কর্ম্মচারিগণ কি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী? তিনি তাহার উত্তরে প্রসন্নবদনে বলিলেন, "আমি তাহাদের সবারি কাণে ব্রহ্মনাম ফুকিয়া দিয়াছি।" মহর্ষির পুণ্য, প্রেম ও শুভইচ্ছা রূপ জলধির পারাপার ছিল না। সেই জলধি হইতে কাহার জাবন তরণী যদি প্রবৃত্তির তুফানে ভয়াবহ ভবসাগরে গিয়া পড়িয়া হাবুড়বু খায় অর্থাৎ জমিদারির কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যদি এক বা একাধিক ব্যক্তি স্বায় কর্ম্মদোষে দূষিত কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অনর্থকতা উৎপাদন করিয়া বিপন্ন হয় এবং তাহাতে তাঁহার মনিবের প্রতি সাধারণে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ সেইরূপ নিন্দাদি করিলে তাহা বড়ই অসন্তোষকর বোধ হয়।

ভারতবর্ষের সভ্য জাতীয় লোকেরা বলেন "বাঙ্গালীরা বড় বাচাল," "মুখ সর্ব্বস্ব" এটা ফলে উপহাসের কথা। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ চরিত্রের যশঃসৌরভ যখন তাঁহাদের

সকলের মধ্যে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিপন্ন করিবে যে তাঁহার মহৎ জীবনাদর্শ বঙ্গীয় জাতীয় জীবন সংগঠনের পক্ষে বিশিষ্ট উপায় স্বরূপ তখন তাহারা ঐরূপ উপহাস বাক্য পরিহার করিয়া বঙ্গবাসিদিগকে মর্য্যাদাদানে তাহাদিগকে ও নিজেদেরকে যে সুখী করিবেন তাহা সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

জমিদারি বিষয় কর্ম্মসম্বন্ধে মহর্ষির জীবনের একটী মহৎ কার্য্য এস্থানে বর্ণন না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না, তাহা এই যেঃ—মহর্ষির পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারি মধ্যে পদ্মানদীর চর লইয়া কয়েকটী জমিদারের সহিত তাঁহার এবং সেই সকল জমিদারদিগের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত গজ কচ্ছপের ন্যায় বাদ বিসম্বাদ প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। তাহাতে মামলা মোকর্দ্দমার জের বৎসর বৎসর চলিত; এবং অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়া তাহা ব্যবহারাজীবিরূপ দামোদরগণের অতলস্পর্শ উদরে গিয়া পতিত হইত। ঐ সকল জমিদারীর আয়ের

বিস্তর টাকা এইরূপে ব্যয় হইয়া যাইত, অথচ যে বিবাদ সেই বিবাদই বিদ্যমান থাকিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনে দেশবিদেশে ও হিমাচলে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন তাহাতে ঐ সকল হাঙ্গাম হুজ্জত স্বয়ং দেখি বার অবসর পাইতেন না। তিনি যখন উক্ত সর্ব্বনেশে ব্যাপারটা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলেন তখন স্বীয় জমিদারি মহলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া যে একটা বিশুদ্ধ উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহা তিনি ঐ চর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সংলিপ্ত জমিদারগণকে লিপি দ্বারা জানাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই ঃ—"চরঘটিত বহুদিনের বাদ বিস স্বাদ একেবারে মিটাইয়া ফেলিলে ভাল হয়। বৎসর বৎসর বহু টাকা সেকারণ মাম্‌লা মোকদ্দমায় ব্যয় হইয়া যাইতেছে। জমিদারির আয়ের যত টাকা এ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে ব্যয় হইয়া গিয়াছে তাহা একত্র করিয়া ধরিলে পদ্মার চর ঘটিত

বিবাদী জমির মূল্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বেশী হইয়া গিয়াছে; অথচ কোথায় যে ঐ বিবাদের শেষ হইবে তাহার কোন উপায় দেখা যায় না। একারণ একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেখানে সকলেই সমবেত হইয়া শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়াই শ্রেয়স্কর।" তাঁহার ঐ লিপির উত্তরে তাঁহারা সকলেই মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "আপনি যে মীমাংসা করিয়া দিবেন তাই আমরা গ্রহণ করিব।" মহর্ষি তদুত্তরে বলিলেন "আজকার দিনে চরের জমি যাহার দখলে যাহা আছে তাহাই থাকুক তাহা লইয়া আমরা আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ করিবনা এই মর্ম্মে এগ্রিমেণ্ট লিখিত হউক।" তাহাতে অভ্যাগত জমিদারগণ সকলেই সম্মত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এইরূপে ঘোর বিবাদ স্থলে কুশল ও সুখশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই হইতে তাঁহাদের মধ্যে পদ্মার চর ঘটিত মোকদ্দমার প্রশস্ত পথটা একে-

বারে বন্ধ হইয়া গেল। তাহাতে ধর্ম্মাধিকরণ ক্ষেত্রের দামোদরগণের খোরাক কমিয়া গেল দেখিয়া তাঁহারা বিষাদিত হইলেন। এতদ্দারা উক্ত জমিদারগণের মধ্যে কুশল হইয়া জমিদারদিগের যে কেবল মোকদ্দমার ব্যয়ভার কমিল তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণে আবার শান্তি বায়ু বহিয়া যে সয়াস্থি আনিল তাহা তাঁহাদের পরমায়ু বৃদ্ধির পথে ও সহায়ক হইল। একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পুণ্যসম্ভূত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যে মঙ্গল ফল উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা কেবল যে তাঁহারই জীবনের কার্য্যাবলী কল্যাণপ্রদ হয় তাহা নহে অন্যের জীবনেও তাহা সংক্রামিত হইয়া কতনা হিতসাধন করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া চিন্তাশীল ও প্রবীণ ব্যক্তিরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শাস্ত্রে আছে যে ধর্ম্মেরই জয় হয়; অধর্ম্ম ও অসত্যের জয় কখনই হয় না; তাহা মহর্ষির পুণ্যময় জীবন বিবিধ প্রকারে প্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহাকে

ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই তাঁহারা ও তাঁহার স্বর্গারোহণের পর যখন দেখিলেন স্বদেশের ও বিদেশের ধর্ম্ম পরায়ণ ও গুণজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তিরা তাঁহার যশকীর্ত্তন করিতেছে এবং কোন কোন নগরে সভা আহুত করিয়াও বহু বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাঁহার পবিত্র জীবনের ও তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মের কত না প্রশংসা করিতেছেন তখন তাহারা (অর্থাৎ মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রতিবাদ কারিরা) বুঝিলেন যে তাহারা ভ্রমান্ধ কিংবা স্বার্থপরবশ হইয়া ঐ মহাপুরুষের কার্য্যকলাপের যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য করিতে পারিয়াছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আবার মহর্ষির দেহান্তের পর অনুশোচনা করিতেও দেখা গিয়াছে। মানুষের এইরূপ ব্যবহার এ পৃথিবীতে কিছু নূতন ব্যাপার নহে। সাধু পুরুষদিগকে জীবদ্দশায় অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। এ পৃথিবী হইতে লোকের অজ্ঞতা ও দোষ দুর্ব্বলতা যে একবারে

তিরোহিত হইবে তাহা অসম্ভব। তাই সাধু জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যে অনেক দুঃখ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় তাহা অনিবার্য্য। এই গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। সাধু মহাপুরুষদিগের দেহান্তের পর তাহাদের নিন্দা ও নির্য্যাতনকারীদের হিংসা, দ্বেষ, এবং অজ্ঞতা কুসংস্কার, কিরূপে সংশোধিত হয় তাহা লইয়া বহু শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে কিন্তু মহর্ষিদেবের প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার "True Faith" নামক গ্রন্থে সংক্ষেপে যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা খুব সারকথা বলিতে হইবে। তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The world needeth a glass to rectify its vision, and this death alone presents.

For through death faith is seen in truer colours and better understood.

Then the refraction through prejudice, envy and ignorance is corrected."

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গার্হস্থ্য জীবন।

অশেষ সহিষ্ণুতা উদারতা ক্ষমা এবং আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি গভীর প্রেমের ব্যবহার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবদ্দশায় তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কতনা উপায় চিন্তা এবং সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন এ সম্বন্ধে বড়ই প্রীতিকর ছিল। তিনি যেমন স্নেহ মমতা করিতে জানিতেন, তেমনি তাঁহার বংশধর ও আত্মীয় স্বজন এবং শিষ্য ও শ্রোতৃবর্গ হইতে ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। স্নেহ নিম্নগামী এবং ভক্তি ঊর্দ্ধগামী। এই দুয়ের মধ্যে আদান প্রদান সম্ভূত সদ্ভাবযোগে বহুতর

কল্যাণ উৎপাদিত হয় তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে প্রচুর পরিমাণে ফলিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

তাঁহার উদারভাব ও আন্তরিক প্রীতির বিকাশে তাঁহার পারিবারিক নিয়ম ও ব্যবস্থাদি এত কল্যাণ ও উপদেশপ্রদ ভাব ধারণ করিত যে, যে কেহ তাহা দেখিত সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশে একটী সন্তান জন্মিলে সে সংবাদ তাঁহাকে অবিলম্বে দিতে হইত; ভৃত্যদিগের মধ্যে যে সেই সংবাদ মহর্ষিকে অগ্রে দিত সেই তৎক্ষণাৎ দশটী টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। এই কারণ ভৃত্যেরা নিজেদের মধ্যে এমন পালাগঠিক্ করিয়া লইত যে সবাই যেন সে পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় একবার না একবার পায়। সন্তান প্রসূত হইলে তাহার যত্ন সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ দান করিতেও বিরত হইতেন না। তাঁহার পরিবারস্থ বালক

বালিকাদিগের সকলকেই একত্র হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে নিত্য একবার দেখা দিয়া আসিতে হইত। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের লেখা পড়ার বন্দোবস্ত যেরূপ হওয়া বিধেয় তাহা যথাযথভাবে তাঁহার উপদেশানুযায়ি সম্পন্ন হইত। কোন প্রকার সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার নিকট বাদ পড়িত না। যখন তিনি বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন তখনও পারিবারিক হিতার্থে গৃহে উপদেশ ও বিধি ব্যবস্থা যথাবিধি নির্দ্ধারণ করিয়া যাইতেন। যাঁহারা ব্রহ্মবান সাধুপুরুষ তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকেন।

আত্ম সংযম ও প্রিয় সম্ভাষণ তাঁহার স্বভাবের বল ছিল। উপনিষদের দিব্য মন্ত্র সকলের মর্ম্মাবধারণপূর্ব্বক ও প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের শাস্ত্রীয় অনুশাসনানুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার জীবনের বহুল কর্ত্তব্য সাধনে রত থাকিতেন তেমনি নিজের গার্হস্থ্য জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনা করিতেন। ফলে তিনি গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে এতদূর

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে কিছুতেই তাঁহার চিত্তের শান্তির বিলোপ হইত না। যথার্থ ধীরতা সহ তিনি জীবনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি ঈশ্বরেরই আদিষ্ট কার্য্য বলিয়া তাহা প্রফুল্লচিত্তে সম্পাদন করিতেন। এই যে দেবভাব জনিত তাঁহার কার্য্যাভাসের দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা ভারতে ভাবী পারিবারিক জীবনের কুশল ও উন্নতি পক্ষে কতনা উপকার দর্শিবে। তাঁহার পরিজন-বর্গের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করেন নাই। শিক্ষিত মহলে তাঁহার পরি-জনগণ মধ্যে অনেকে উচ্চস্থানে আরূঢ় ও বিশেষ যশোভাজন হইয়াছেন। এ সমস্তই মহর্ষির বিশুদ্ধ কর্ম্ম জীবনের ফল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আপনার বংশধর এবং ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে বিষয় বিত্তাদি বিভাগ করিয়া দিয়া যান তখনকার তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যেরূপ পরিচয়

পাওয়া গিয়াছিল তাহা এক অসাধারণ ব্যাপার বলিতে হইবেক। যখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বিষয় বিত্ত সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বিদ্যমানে একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান যাহাতে তাঁহার অবিদ্যমানে কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "তোমরা তিন দিন পরে আবার এখানে এসো।" তৎকালে মহর্ষি পার্কষ্ট্রীটে বাস করিতেছিলেন। ঐ তিনদিন মধ্যে একদিন স্বর্গগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহর্ষিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তিনদিন পরে আসিলে পর তিনি কি বলিবেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে "বাবা বেঁচে থাক্‌লে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে যে চক্ষুতে বিষয় বণ্টন করিয়া দিতেন আমি এখন সেই চক্ষু আমার চক্ষুর মধ্যে আনিতেছি" অর্থাৎ সেই চক্ষুতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে বিষয় ঠিক করিয়া দিবেন। তিন দিবস পরে তাঁহারা মহর্ষির সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জমিদারি মধ্যে যেটি

উৎকৃষ্ট তাহাই দিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত মহর্ষিদেবকে প্রণিপাত পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই বৃত্তান্ত আমরা তৎকালে উক্ত শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি আমারদিগকে আরও বলিয়াছিলেন অনেকে মনে করিত যে মহর্ষির পিতৃদেব স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারি মধ্যে উক্ত জমিদারি বিষয়টী তিনি তাঁহার পুত্রদিগকেই দিয়া যাইবেন; কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে তাহা দেওয়াতে অনেকেই আশ্চর্য্য হইলেন এবং মহর্ষির মহত্ত্ব ও উদারতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার পিতৃদেবের একান্ত স্নেহ ও বিশ্বাস থাকায় তিনি তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত বিষয় আশয়ের ভার দিয়া তাঁহাকে ট্রষ্টি (Trustee) নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদিচ কখন কখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ধর্ম্মভাব এবং বিষয় বিত্ত প্রতি ঔদাস্য

ভাব দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তিত হইতেন তথাপি মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের পিতার অভিজ্ঞতা, মহত্ত্ব ও পুরুষার্থতা এত উচ্চভাবাপন্ন ছিল যে তিনি প্রতীতি করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ হইতেই তাঁহার বংশ ও বংশীয় মান সম্ভ্রম ও বিষয় বিত্তাদি প্রকৃতপক্ষে রক্ষিত হইবেক। ইহা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতি পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবীণতার সুন্দর পরিচয় তাহা কে না বলিবে। এস্থলে আর একটি গূঢ় তাৎপর্য্যের তত্ত্বকথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই যে যখন দৈববলে মানুষের জীবনে এক স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং তাহা তাহার জীবনকে নূতনাকারে গঠিত করিতে থাকে তখন পূর্ব্ব জীবনের যে ভাঙ্গা চূরা হয় তাহা এক বিষম পরীক্ষা উপস্থিত করে। ইহা যুবা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে হঠাৎ প্রবল বন্যার ন্যায় আসিয়া পড়িল। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, সম্পদ, মান সম্ভ্রম রূপ বাঁধ যাহা তাঁহার জীবন-ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল তাহা দামোদর নদের প্লাবনের

স্থায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় লইয়া গেল। ফলে তাহা এক ভয়াবহ দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। ঠাকুরবংশের মহা ধনীমানী দিব্য কান্তিধারী যুবা দেবেন্দ্রনাথ তখন ঐ প্লাবনের পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে ভাসিয়া কোথায় যাইতে-ছিলেন তাও জানিতেন না। এই অবস্থায় ভক্ত সুফি "হাফেজের" আত্মার সহিত তাঁহার আত্মার নিগূঢ় প্রেমবন্ধন হয়। "হাফেজ" ব্রহ্মাণ্ডপতির নামে ও প্রেমে "মশ্‌গুল্‌" হইয়া গজল গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন :—"সেই অভিলাষে বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক, যদি বিদ্যুত পড়িয়া ধন ধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে আর বড় আশ্চর্য্য নহে।" "হাফেজ" সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরমা-ত্মীয় স্বরূপে তাঁহার সহায় ও সান্ত্বনার স্থল হইলেন। গজলের পর গজল ধ্বনিত হইয়া মহামহিমান্বিত পুরুষ সনাতনের সিংহাসন স্পর্শ করিতে লাগিল। দুই প্রাণ এক হইয়া গেল ;—

আনন্দের পর আনন্দ লহরী উঠিতে লাগিল। মহর্ষির প্রাণ হইতে সে সময় কত বৈরাগ্য-সম্ভূত হৃদয়ভেদী বাণী উঠিতে লাগিল এবং প্রাণের গূঢ় কথা সকল ব্যক্ত হইয়া পড়িল তাহা তাঁহার ধর্ম্মজীবন বৃত্তান্তে অভিব্যক্ত হইবার উপযোগী। তাহার কিঞ্চিৎ এই গ্রন্থের ২১।২২ পৃষ্ঠে বর্ণিত হইয়াছে।

মহর্ষির এই বিষম পরীক্ষাকে অগ্নি পরীক্ষা বলিতে হইবেক। তাহাতে যেমন তাঁহার নব-জীবনের অভ্যুদয় হইল তেমনি তাঁহার বিষয় আশয় এবং ধন দৌলতের মধ্যে যাহা কিছু অসংগত বা অসন্তোষকর বলিয়া তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছিল অথবা তাঁহার নবজীবনের* আলোকে তাঁহার

---

* St. Francis de sales of Geneva এইরূপ বলিয়াছেন :— "Shall we not, in future, cease to be the old selves, which shall all, without exception, be for ever sacrificed unreservedly & unconditionally to God and his love ?"

"বিশ্বজিৎ যজ্ঞের" অগ্নিতে পুড়িয়া সংশোধিত হইল তাহা খাঁটি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল হওত ব্রহ্মকৃপার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গার্হস্থ্য জীবনে বহুবহু দুঃখ, ক্লেশ, পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া সাধনবলে প্রশান্তচিত্ত হওতঃ তাঁহার প্রাণপুরে উপলব্ধি করিলেন যে সৃষ্টিতে কেবলমাত্র ভগবৎ ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে। মানবের যে ইচ্ছার বেগ তাহা যখন ভগবৎ ইচ্ছার অনুযায়ী হইয়া চলে তখন তাঁহারই ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে; আর সেই ইচ্ছা যখন তদ্বিপরীতভাবে চলিতে থাকে তখন তাহা নানাদিক হইতে নানারূপ বিঘ্নের ধাক্কা খাইয়া পরিণামে ঈশ্বরের অভিপ্রেত ঠিক পথে আসিয়া উপনীত হয়। এতদ্দারা সেই বিধাতা পুরুষের নিয়মানুসারেই মানবের অবস্থা সুব্যবস্থিত হইয়া থাকে। ফলে সর্ব্ব মূলাধার ব্রহ্মাণ্ডপতির অভিপ্রায় যাহা তাহাই সংসিদ্ধ হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে বিশেষতঃ গার্হস্থ্য জীবনের বহুল পরীক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া

অভিজ্ঞতা লাভে দেখিলেন যে মানুষ নিজের ইচ্ছার বলে প্রকৃত পক্ষে কোন স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না; তখন তিনি আত্মাতে পরম শান্তিলাভ করতঃ স্বীয় ইচ্ছার বেগ জনিত অন্তর্দ্দাহ ও মনঃপীড়া হইতে মুক্ত হইলেন। তৎকালে তিনি সকল কাজই ঈশ্বরের কার্য্য জ্ঞানে সচ্ছন্দচিত্তে সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

প্রাগুক্ত ক্ষেত্রে সাধুদিগের ইচ্ছা ঐশী ইচ্ছার সহিত যোগযুক্ত হয়; এবং কামনার বেগ জনিত অন্তর্দাহ—জ্বরটা আর থাকে না। তখন তাহারা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবাতে সকল কার্য্যেই সন্তুষ্টচিত্ত থাকেন। তাই St. Francis de sales মহাশয় বলিয়াছেন :—

"A *person who is free from the fever of his own will is satisfied with every thing provided* God be served."

আমরা মহর্ষির জীবনের বহুব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছি যে তিনি যাহা ঐশীইচ্ছার কার্য্য

বলিয়া প্রত্যাদিষ্ট হইতেন তাহাতে তিনি স্বভাবতঃ তৃপ্তিলাভ করিতেন। ক্রমে তাঁহার আত্মিক অভিজ্ঞতা ঘনতর হইয়া তাহা অনুপ্রাণনে পরিণত হওয়ায় তাঁহার নিজের ইচ্ছাকে পরমাত্মার ইচ্ছাতে মিলিত হইতে দেখিয়া ধ্যান সমাধিতে কতনা আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপ ধর্ম্মভাব হইতেই তাঁহার কর্ম্ম উদ্ভূত হইত। তাহা তাঁহার কথায় বা কথোপকথন কালে এবং বক্তৃতায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহার অন্তরের ভাব জানা যাইত। তিনি একবার সিন্দুরিয়া পটি পারিবারিক প্রার্থনা সমাজে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাব কি উচ্চ!—কি গভীর! কি হৃদয়গ্রাহী! তিনি এইভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রকে বিশ্বপতি যে নিয়মে পরিচালিত করিতেছেন সেই নিয়মে সেই ভাবে তাঁহাকে তিনি পরিচালনা করেন এই তাঁহার প্রার্থনা। তাহারা যেমন তাঁহার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম না করিয়া তাঁহার

একান্ত বাধ্য হইয়া চলিতেছে ঈশ্বর তাঁহাকে ঠিক্ সেই ভাবে চালান ইহাই তিনি চাহেন। ইহা কি ঐকান্তিক নির্ভরের ভাব!—কি গভীর আত্ম তত্ত্বজ্ঞানের কথা!

মহর্ষির ধৈর্য্য ক্ষমা, আত্ম দমন, উপেক্ষা ও সমাহিত অবস্থা এবং প্রেম পৃথিবীর বা লোক-মণ্ডলীর গণ্ডীর ক্ষুদ্র সীমা এড়াইয়া অনন্তে সংযুক্ত হইয়াছিল। সাধনে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাহার বৃহৎ গৃহস্থালীতে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া স্বকর্ত্তব্যসাধনে এতাধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদ ও তপঃ-প্রভাব এই দুই তাঁহার অনুকূল ছিল। এই হেতু তাঁহার জীবনের সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মে যে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন ও কুশল দর্শন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৃহস্থেরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গার্হস্থ জীবন কাহিনী পাঠে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি এবং তাঁহার আদর্শ জীবনের অনুসরণে যে অতীব উপকার লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেশ হিতৈষিতা।

দেশের মঙ্গল জন্য আন্তরিক হিতচেষ্টা।
নিষ্কামভাবে স্বদেশের উপকারের
জন্য বিশেষ যত্ন ও অর্থ ব্যয়।
আড়ম্বর শূন্যদান।

যখন বঙ্গে "দেশ হিতৈষিতা" বলিয়া এখনকার মত উচ্চধ্বনি সংযুক্ত ধূয়া উঠে নাই, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সকল দেশ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ আড়ম্বর শূন্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশের প্রকৃত উপকার সাধনার্থে তখনকার সময়ে তিনি তত্ত্ব-বোধিনী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সাময়িক পত্র-ক্ষেত্রে তাহা এক নূতন ব্যাপার বলিয়া তৎকালে পরিগণিত হইত। এই গ্রন্থের যড়বিংশ পরিচ্ছেদে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

বোলপুর শান্তি নিকেতনের ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন (যাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি) ইহা দেশ হিতৈষিতা সম্বন্ধে মহর্ষির যে অতি মহৎ কার্য্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

স্বদেশ হিতকর কার্য্য উপলক্ষে যখন যে ব্যক্তি বা সভাসমিতি হইতে অর্থ সাহায্য জন্য মহর্ষির নিকট আবেদন পত্র আসিত তাহা তিনি প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়া যথানুরূপ সাহায্য দান করিতেন। তাহাতে তিনি কখন বিমুখ হয়েন নাই। কলিকাতা ডিষ্ট্রীট চ্যারিটেবল ফণ্ডে তাঁহার পিতৃদেব এক লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে পর তাঁহার সৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ টাকা মায় সুদ সমেত হিসাব করিয়া তাঁহার স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ঐ ফণ্ডে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে শ্রোতামাত্রেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টান স্কুলে হিন্দু ছাত্রদিগকে খৃষ্টানেরা প্রলোভিত করিয়া খৃষ্টান করিত। এই দেখিয়া তাহা নিবারণার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশের হিত লক্ষ্যে কিরূপ মহাকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা তাঁহার আত্মজীবনী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল,—বলিল যে, "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশ চন্দ্রের স্ত্রী, দুই জনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশ চন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ্ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের

নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুকে খ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।" এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খৃষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল—"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ও কি আমাদের চৈতন্য হয় না। আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর,

তবে মিশনরিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রি-দিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথা? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়। খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করতঃ আপনা-দিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করি-তেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশ গুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়?” শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে

তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায়-বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রাম-গোপাল ঘোষ, আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্ম-সভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খৃষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। ৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহাসভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব আমা-দের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা। রাজা

রাধাকান্তদেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা সাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে হিন্দু-হিতার্থী নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল—একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

স্বদেশের হিতসাধন করিতে গেলে হিতসাধকের জীবন অগ্রে ধর্ম্মানুগত কর্ম্মের দ্বারায় বিশুদ্ধ হওয়া চাই। এইরূপ বিশুদ্ধ কর্ম্মজীবন দেশের হিতার্থে বিশেষ ফলদায়ক হয়। শত শত জন সকাম ও উপাধি-অন্বেষণকারীদিগের মধ্যে একজন নিষ্কাম দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষী বদান্য পুরুষ যে চির স্মরণীয় হইয়া লোকমণ্ডলে আদর্শরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাহা ইতিহাসে ও জনশ্রুতিতে বিদিত আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হিতকর কার্য্যাবলী এইরূপ এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

সচরাচর বঙ্গদেশে দেখা যায় যে, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কোনরূপ দেশ-হিতজনক কার্য্যে মোটামুটি টাকা দান করিলে রাজদরবার হইতে উপাধি প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকেন। এবং সংবাদ-পত্র-রূপ এদেশের একালের নবাকার ঢাকগুলির বাদ্য যাহাতে বাজিয়া উঠিয়া আসরটা জমকায় সেজন্য ঐরূপ দান করিয়া কর্ণ খাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দানকার্য্য একেবারে নিষ্কামভাবে সম্পন্ন হইত। তিনি কোন উপাধি পাইবার ইচ্ছা করিতেন না; তাহা প্রদত্ত হইবে শুনিলে তিনি মানা করিয়া পাঠাইতেন। শুনা যায় দুইবার তাঁহাকে রাজা উপাধি দিবার জন্য প্রধান রাজ-পুরুষদিগের ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা তিনি লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহর্ষির ন্যায় একান্ত নিস্পৃহ দাতা এদেশে অতি বিরল। উপনিষদের বাণী "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্"; তাহাই তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। দান অতি কঠিন কার্য্য। দাতা সকাম হইয়া দান করিলে সে দানে

বাস্তবিক কোন ফল দর্শে না। আবার দান-কার্য্যে কামনা-গত দোষ ঘটিলে দাতাকে পতিত হইতে হয়, ইহাও শাস্ত্রে আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দয়ার্দ্র ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রার্থীকে যথানুরূপ অর্থদান করিতেন। এই আদর্শ আজকাল দানকারী ব্যক্তিদিগের অনুকরণীয়। মহামতি ঈশা বলিয়া গিয়াছেন এইরূপভাবে দান করিতে হইবেক যে, "দক্ষিণহস্ত দান করিলে যেন বামহস্ত জানিতে না পারে।" এই কথা বড়ই তত্ত্বপূর্ণ। এইরূপ দানই যথার্থ দান এবং ইহাতেই ভগবান প্রসন্ন হয়েন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেশ-হিতৈষিতার কার্য্য একান্ত ধর্ম্মানুগত ভাবে সম্পন্ন হইত, তাহা আমরা উপরেও উল্লেখ করিয়াছি। আসল কথাটা এই যে তিনি ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি চক্ষু রাখিয়া শুভকর্ম্ম সাধনে তৎপর থাকিতেন। লোকের চক্ষুর প্রতি তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া সাংসারিক ভাবে কোনও রূপ দেশ-হিতকর কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে সতত বর্জ্জনীয় ছিল। স্বদেশকে তিনি অন্তরের সহিত ভাল

বাসিতেন। সে ভালবাসা বোধগম্য করা তাঁহারই ভাগ্যে ঘটে যাঁহার চিত্ত ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন। ভগবৎগীতায় দেখা যায় যে, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ভক্তি এবং তদনুগত সকল উপদেশ ও সকল কার্য্য ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন-সম্বলিত। সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত কথা ব্রহ্ম-প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন লইয়া অভিব্যক্ত হইত। তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝিতে গেলে তাঁহার গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হয়, বিশেষতঃ "ব্যাখ্যান" নামক তাঁহার গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিলে তাহা বিশদভাবে অবগত হওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ-খানি শাস্ত্র-বিশেষ বলিতে হইবে। দেশের হিতের জন্য জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার ঐকান্তিক ও আন্তরিক প্রার্থনা কত যে প্রাণস্পর্শী, তাহা ইংরাজীতে ভাষান্তরিত তাঁহার আত্মজীবনী হইতে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"O Lord my God ! illumine this our be-nighted Motherland, cast thy look of grace

on these thy children, who are so weak and helpless. Who else but thou canst help this down-trodden land, which is begirt by endless troubles and calamities, and from which lamentations rise up to heaven day and night. Do thou save our country from the depth of degradation into which it hath sunk. Send righteousness unto it, O Lord ; for in righteousness is our salvation. On every soul do thou pour down thy waters of mercy and reveal thyself as our Father and our Mother, that we may worship thee with our whole heart. Oh ! when will that day dawn upon this land, when all her sons will unite in indissoluble brotherhood, and worship thee with one accord ? Our little efforts can accomplish nothing ; O thou that crownest all work with success, grant us thy grace.

* *Vide* Maharshi's Auto-Biography (in English) page 190.

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শেষাবস্থা ও তিরোধান।

"ধর্ম্মের সাক্ষী কর্ম্ম
ও
কর্ম্মের সাক্ষী মৃত্যু"।

এই প্রবাদ-বাক্যটীর মর্ম্ম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল, একালে আর কোথাও সেরূপ দৃষ্টি-গোচর হয় না। ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ-কর্ম্মজীবন-যাপনকারীদিগের মৃত্যু-ঘটনা দর্শনে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মহাপুরুষদিগের জন্মগ্রহণে, দেহ-ধারণে এবং তিরোধানে পরমপিতা পরমেশ্বরের কত যে মঙ্গল, কত যে প্রেমের ভাব প্রকাশিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ পৃথিবীতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে তাহা মুখ্যভাবেই হউক আর গৌণ-ভাবেই হউক ঈশ্বরের দয়ারই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। ফলে

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিন সাধনে সিদ্ধিতে উপনীত হইলে সাধক যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মসেবী হইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধরাধামে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

গীতাকারের অভিপ্রায় যে সাধক উপযুক্ত সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে যোগী হওত অচ্যুত ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনে স্বীয় জীবনে সেইরূপ সার্থকতা লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহবাস করিবার সুযোগ পাইতেন, তাঁহারা মহর্ষির দেবভাবাপন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজেদের জীবনকেও ধন্য মনে করিতেন। কি উত্তর-পশ্চিম, কি পঞ্জাব, কি বম্বাই, কি মাদ্রাজ,* কি লঙ্কাদ্বীপ, এমন কি

---

* "মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বুচিয়া পাণ্টলু মহর্ষিকে দেখিবার জন্য হৃদয়ের অনুরাগে মাদ্রাজ

ইয়োরোপের † ধর্ম্মপরায়ণ অনেক ব্যক্তি মহর্ষিকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহার উপদেশ ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া পুলকিত হইতেন।

পরিত্যাগ করিয়া মশূরী পর্ব্বত উদ্দেশে আগমন করিতেছেন সংবাদ পাওয়া গেল। একদিন আহারান্তে মহর্ষির নিকটে বসিয়া আছি, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, ভৃত্য আসিয়া একখানি কার্ড দিল, তাহাতে লেখা আছে, "বুচিয়া পান্টুলু"।

আমি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলাম এবং স্নানাহারের অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি মহর্ষিকে না দেখিয়া স্নানাহার করিতে চাহেন না। আমি তাঁহাকে মহর্ষির নির্দ্দেশ বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনি স্নানাহার করিয়া আমার সঙ্গে মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহর্ষি যতই অগ্রসর হন, "বুচিয়া পান্টুলু" ততই পশ্চাৎপদ হইয়া সরিয়া যান। মহর্ষি যত পশ্চাৎপদ হন, তিনি তত অগ্রসর হইয়া তাঁহার দিকে যান। মহর্ষি নিরুপায় হইয়া একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, অমনি "বুচিয়া পান্টুলু" তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পাঁচ মিনিট কাল পড়িয়া রহিলেন। তদনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহর্ষির মুখের দিকে তাকাইয়া করযোড়ে অতি মধুর স্বরে সংস্কৃত মন্ত্রে স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন।" (স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উক্তি)

† ইয়োরোপের অনেকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে জানিতেন ও শ্রদ্ধা

পরলোকগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে তাঁহার তিরোধান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"তিনি ১৮২০ শকের ২৭ কার্ত্তিক শুক্রবার পার্ক ষ্ট্রীট হইতে যোড়াশাঁকোর নিজ বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহার বহির্বাটীর তৃতীয়-তলস্থ যে গৃহে তিনি পূর্ব্বে কেশববাবু ও

করিতেন, তন্মধ্যে রেভারেণ্ড মিঃ ভয়েসি (Revd : Mr. Voysey) একেশ্বর-উপাসক তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি মহর্ষিকে লিখিয়াছিলেন ঃ—"আপনার ফটোগ্রাফ আমার লিখিবার টেবিলের উপর আমার সামনেই রক্ষিত থাকে। যখন আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখি তখন লিপি পরিচালনে আমার মনে কতনা বল আইসে; তাহাতে আমার লেখাটা খুব চলিতে থাকে।

ফ্লেচার উইলিযাম (Mr. Fletcher Williams, M.A.) নামক একজন মহাপণ্ডিত একেশ্বরবাদী বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাসকালে একদিন প্রাতে মহর্ষিকে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া (kneel down) বসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষিদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া বলিলেন

"God is love" and love is God"

যুবক ব্রাহ্মগণকে লইয়া অহরহ ধর্ম্মালোচনা করিতেন, সেই গৃহে একান্তে সমাধিযোগাবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ৮ বৎসর কাল এই একই গৃহে একাসনে বসিয়া, একই শয্যায় শয়ন করিয়া এবং কচিৎ সমাগত কোনও কোনও ভক্তগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া কালযাপন করিতেন। আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিৎ ব্যতীত এরূপ একাসনে এত দীর্ঘকাল স্থির থাকা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

এই সময়ে আমার প্রাত্যহিক কর্ম্ম এই ছিল যে, কোনদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতাম; কোনদিন দেওয়ান হাফেজ, কোনদিন বা তাঁহার নোট বুকে উদ্ধৃত এক একটি বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতাম। সেই নোটবুক হইতে কয়েকটি বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The universe is the manifestation and abode of free mind. The PARAMATMA embodying his personal thought in its adjustment realizing his own idea' in its phenomena."

"We lack everywhere for physical sig-

nals of an ever-living will and decipher the universe as the autobiography of an infinite spirit."

(POEM)

Through all this life's eventful Road
Fain would I walk with Thee my God,
And find thy presence light around,
And every step on holy ground.
Each blessing would I trace to Thee,
In every grief thy mercy see,
And through the paths of duty move,
Conscious of Thine encircling love.
And when the angel Death stands by,
Be this my strengh, that Thou art nigh,
And this my joy, that I shall be
With those who dwell in light with Thee.

*১। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-জ্ঞান হয়।

২। বিজ্ঞান বা তত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববাদী-সম্মত নিগূঢ় সত্য সকল আবিষ্কৃত হয়।

৩। আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।"

এ জগতে মহাত্মাদিগের কর্ম্মজীবনের বিবরণ বিবৃত করিতে গেলে, তৎসহ তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। মহর্ষির শেষাবস্থায় তিনি বহুদিন হইতেই পরলোক গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার মানবলীলা সম্বরণের তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তিনি বাহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নিতান্ত নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি তাঁহাদের সহিত কদাচিত বাক্যালাপ করিতেন। এই সময়ে তিনি কেবল যোগানন্দে থাকিতেন। তাঁহার একজন ভক্ত শিষ্য তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমি আর এখানে নাই, অমর-লোকে আছি।" *

যিনি এইরূপে পারমার্থিক ও পারলৌকিক

* প্রাগুক্ত নোটবুক হইতে মহর্ষির অনুপ্রাণন-সম্ভূত যে সকল বাণী উক্ত শাস্ত্রী উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উপরে প্রকাশিত হইল মাত্র।

চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি স্বীয় জীবনে ধর্ম্মসাধনে কতদূর সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধান-পূর্ব্বক অবধারণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি একজন প্রাণযোগে যোগস্থ পুরুষ ছিলেন।

এখনকার জড়বাদ ও বিলাসপ্রিয়তার কালে মহর্ষির আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতা ও যোগাবস্থা দর্শনে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই তাঁহাকে কত না সাধুবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের আশা এই যে ভবিষ্যতে এ দেশের লোকেরা তাঁহার গ্রন্থাদি ও জীবনচরিত পাঠ করিয়া বহু উপকার লাভ করিবেক; এবং বর্ত্তমান সময়ের ভৌতিক বস্তুর প্রতি লোকের যেরূপ আসক্তি ও তদন্তর্গত নাস্তিকতার প্রভাব, তাহারও অপনোদন হইবে। আর একালের শিক্ষার ফল যে স্বেচ্ছাপ্রিয়তা ও গুরুজনের প্রতি অনাস্থা, তদ্দ্বারা তাহাও ক্রমে লাঘব হইবে। প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও অনুশাসন অনুযায়ী ভারতবাসীরা ধর্ম্মসাধন করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ফল লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং

ভারতে আবার সুদিন আইসে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আজীবন সেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্য ও অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে যে কিছু হঠকারিতা, ভ্রম ও কুসংস্কার ছিল, তাহা তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম, স্নেহ ও উদারভাবাপন্ন ব্যবহার এবং তাঁহার স্বাভাবিক কুশলপ্রদ ও শান্তি-প্রসূত উপদেশ পাইয়া তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল শিষ্য ও অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদলাভের একান্ত আকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে তাঁহাকে বৎসর বৎসর দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্মতিথি উৎসবের পর একটা দিনধার্য্য করিয়া এবং পৌষী ঊষা সংকীর্ত্তনে ৭ই পৌষে তাঁহার দীক্ষাদিন উপলক্ষে মহর্ষিদেবকে দর্শন করা তাঁহাদিগের পক্ষে যেন একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইল। সেই উপলক্ষে মহর্ষিকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় (গদ্যে ও পদ্যে) কত কত অভিনন্দন পত্র

প্রদত্ত হইতে লাগিল। অহরহ তাঁহার আরাধ্য দেবতা পরব্রহ্মের সুযশ ঘোষণা করিতে করিতে সেই যশে তিনি যশোবন্ত হইতে লাগিলেন। সেই মহিমান্বিত মহান পুরুষের মহিমাকে যে সাধক মহিমান্বিত করেন, তিনি তাঁহার যশকীর্ত্তনকেই জীবনের আধার করিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন। তাই গুরুনানক বলিয়াছেন "হরিকীর্ত্তন জীয়াধার।" ব্রহ্মভক্ত যথাকালে পরমাত্মার বশে লোকমণ্ডলে যশোভাজন হইয়া থাকেন। প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের বৃক্ষরাজির মধ্যে সতত ভ্রমণে ভ্রমণকারীর বস্ত্র ও গাত্র গোলাপের গন্ধে যেমন সুবাসিত হয় পরম সাধু পরমেশ্বরের সহবাসে মানবাত্মা সেইরূপে সাধুতায় আপ্লুত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মহর্ষি বার বার বলিতে লাগিলেন, "আমি বাড়ী যাব,—আমি বাড়ী যাব।" সেই সময় তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র দৌহিত্র, প্রভৃতি বহু আত্মীয় স্বজন তাঁহাদের ঐ পূজ্যপাদ প্রাচীন বংশপতির দেহান্ত হওয়ার সময় আগত-

প্রায় দেখিয়া সকলেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রয়ানের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। অপরাহ্নে বেলা প্রায় দুইটার সময় তিনি সজ্ঞানে বেদমন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সর্ব্বকামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল মহাত্মারা এই ধরাধামে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়েন, তাঁহারাই ব্রহ্মলাভ করেন। গীতায় আছে :—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥

গীতা ৬।২৭

Exquisite joy thus seeks the saint's content
Who rest in peace, all world's attachments
spent :—
The sinless souls divine that godward go
And joined to Him in love of him do grow.
(VI, 27)

(Bhagabatgita in English Rhyme
by Rai Bahadur Biresvar Chakrawarti).

এইরূপ পুণ্যাত্মা সাধু মহাপুরুষের অভাবে মানব-মণ্ডলীতে কত যে শোক দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। মানব-জীবনের দুর্ল্লভ আদর্শ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঞ্চিত হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

স্বদেশে বিদেশে শত শত সমাচার-পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকসূচক সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণ ও কীর্ত্তি-কলাপের অনেক প্রশংসা করিয়াছিল; যিনি মহৎ কীর্ত্তি ইহলোকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন, তিনি চিরস্মরণীয় হন। ইহা দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন :—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং-সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

মহর্ষি চুঁচড়াতে বাসকালে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে দর্শন ও একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলে, তিনি তাঁহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক উপদেশ দান করিয়াছিলেন; তাহা

অবলম্বনে "উপহার"* নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। উহা শাস্ত্রাকারে এখন ব্রাহ্ম-সমাজের সাহিত্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থখানি তাঁহার একজন শিষ্য-স্থানীয় পরমাত্মীয় ভক্তিমান ব্যক্তি ইংরাজীতে পরিপাটীরূপে ভাষান্তরিত করিয়াছেন;—তাহার ভূমিকায় তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"His (Maharshi's)* offering of last words is as it were, a voice from the blessed dead. He whose offering it is, in imminent expectation of a summons to his Maker's presence, meant it to be his final blessing to those so beloved of him on earth."

ভারতের ইতিহাসে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম যে চিরদিনের জন্য পরিকীর্ত্তিত হইবে তাহা

* Extract from preface, by Babu Mohini mohan Chatterjee, of the Maharshi's farewell offering to his desciples, and followers.

বলা বাহুল্য মাত্র। মহর্ষির পরলোক গমনের পর মহাত্মা আনন্দমোহন বসু এম, এ, মহর্ষির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যে শোক-সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা যেমন সমীচীন তেমনি হৃদয়গ্রাহী। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Son of Dwarkanath Tagore, and the first Secretary, I believe, of the British Indian association, he might have been a Maharaja long before this. But he chose the better part. Maharajas die but Maharshis live—live in the grateful hearts of unborn generations."*

* VIDE Introduction Page XX of the English translation from Bengalee of Maharshi's Auto-Biography by SREEJUT SATYENDRA NATH TAGORE and his daughter SREEMUTEE INDIRA DEVI.

শুদ্ধিপত্র

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সম্বন্ধে	সমন্ধে	৯	২
yellow	yellew	ঐ	১১
Beginning	Begining	ঐ	১৯
Engines	Eagines	১২	১২
কর্তৃত্ব	কর্ত্তৃত্ব	২০	১২
আমরা		২৩	৬
আস্থাবান	আস্তাবান্	২৪	১
সম্ভূত	সম্ভূত	ঐ	১৬
নির্দ্ধারণ	নিদ্ধারণ	৩৫	১৫
সর্ব্বেষু	সর্ব্বেযু	৩৮	১৫
নকর্ম্মণা	নকর্ম্মনা	৩৯	২
কেনামৃতত্ব	কণামৃতত্ব	ঐ	ঐ
অমৃতত্বকে	অমৃত্বকে	ঐ	৪
তদন্তর্গত	তদান্তর্গত	৪০	৬
প্রতিকূলে	প্রতিধূলে	৪১	১০
কর্ম্মোৎপত্তি	কর্ম্মৎপত্তি	৫০	১৩

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সাধুমহাত্মগণ	সাধুমহাত্মাগণ	৫০	১৭
কৌতূহল	কৌতুহল	৫৩	১৩
রাজবাড়ী	রাজবড়ী	৫৬	১
তখন	তথন	ঐ	১২
ভর্ত্রা	ভর্ত্তা	৫৭	১৬
একটূ	একটী	৫৮	১
সঙ্কুচিত	সঙ্কোচিত	৫৯	৪
সর্ব্বভূতেষু	গর্ব্বভূতেষু	ঐ	১৮
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা	সর্ব্বভূতারান্তরাত্মা	৫৯	১৮
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ	কর্ম্মাধ্যক্ষ্যঃ	ঐ	ঐ
জোয়ার	জোরার	৬২	১
আহহং	আহহং	৬৩	৬
০	তাহার	৬৯	৩
করিতেন	ছিল	ঐ	৪
মহতোমহীয়ান	মহতোমহিয়ন্	৭১	৮
উদ্ভাসিত	উদ্ভাষিত	৭২	৩
অনুভব	অপূভব	৭৮	১
ঊর্দ্ধগামী	ঊর্দ্ধগামা	৮০	৫
উদ্গীরণ	উগ্দীরণ	৮২	১০

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
দেবেন্দ্র	দেবন্দ্র	৮৪	১
সম্বন্ধ	সমন্ধ	ঐ	৮
সম্বন্ধে	সম্মন্ধে	৮৫	৩
থাকিব	খাকিব	৮৬	১৯
যদ্দ্বারা	যদ্বারা	ঐ	৫
আরোহণ	আরোহণ	ঐ	ঐ
নিবদ্ধ	নিবন্ধ	৯৩	১৪
এতদ্দ্বারা	এতদ্বারা	৯৪	১৮
নিবারণ	নিবাণর	৯৬	৩
যশোধারী	যশধারী	১১১	১
উপলব্ধি	উপলদ্ধি	১৪৮	৮
প্রশংসনীয়	প্রসংশণীয়	১৫৩	৩
কার্য্যাভ্যাসের	কার্য্যাভাসের	১৯৪	৬
বিঘ্নের	বঘ্নের	২১১	১২
সন্তুষ্টচিত্ত	সন্তুষচিত্ত	২০১	১২
সুদীর্ঘ	সুদীর্ঘ্য	২০৩	৯

মূল্য

ফলক-বার্ত্তা।

হরিরূপ ও হরি যশ ঘোষণা	(পদ্য)	৴১০ (অৰ্দ্ধ আনা)
হরি ওঁ	ঐ	ঐ
ধর্ম্মবলে দীপ্তিপায় কর্ম্মের প্রভাব	ঐ	ঐ
আত্মবশ, কৃতি ও স্বাবলম্বী কে?	ঐ	ঐ
উদ্যম ও বঙ্গীয় যুবক	ঐ	ঐ
"প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর" (মহাকবি সার রবীন্দ্রনাথের গীতাংশ)		ঐ
Milton's invocation for inspiration	(Poetry)	ঐ
Affliction a guest	(Poetry)	ঐ

ভারত পরিব্রাজকের বার্ত্তা।

জন্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব	(পদ্য)	(১ম বার্ত্তা)	৶০
নাম তত্ত্ব ও ভক্তিতে নতাবস্থা	(গদ্য)	২য় ঐ	৶০
মানব মণ্ডলে কি সুন্দর দেখায়	(পদ্য)	৩য় ঐ	৵০
উত্তরাখণ্ডধ্বনি	(পদ্য)	৪র্থ ঐ	৶০
সংস্কৃতজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য	(গদ্য)	৫ম ঐ	৶০
স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন	ঐ	৬ষ্ঠ ঐ	৶০
বুনো রামনাথ ওরফে (নবদ্বীপের) রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	(গদ্য)	(৭ম বার্ত্তা)	৶০
ভারত ভ্রমণ ও প্রকৃতিতে প্রাণেশের দর্শন	(গদ্য) ঐ	৮ম ঐ	৶০

		মূল্য
হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন	(পদ্য) ৯ম (বার্ত্তা)	৵০
ভারত পরিব্রাজকের সম্পূর্ণ কবিতাবলী (ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু আলোচনা)	ঐ ১০ম ঐ	৷৷০
ব্রহ্ম নাম ও হরি নাম	(গদ্য) ১১শ ঐ	৶০
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মযজ্ঞ শান্তিনিকেতন (মহর্ষির প্রতিকৃতি সহিত)	১২শ ঐ	৷৶০
স্বর্গীয় সাধু উমেশ চন্দ্র দত্ত (তাঁহার প্রতিকৃতি সহিত)	(গদ্য) ১৩শ ঐ	৷৶০
রাজর্ষি জনক	ঐ ১৪শ ঐ	৶০

উক্ত পুস্তকাদি প্রাপ্তির স্থান।

কলিকাতা—(১) মিনার্ভা লাইব্রেরী ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্। (২) আদি ব্রাহ্মসমাজ বুক ডিপো—৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো। (৩) সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ বুকডিপো—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। (৪) ভবানীপুর সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজ। (৫) কর্ম্মক্ষেত্র সমবায় (ত্রিতল গৃহ)—১৯।৩ ছকুখানসামার লেন।

পশ্চিম—(১) লাহোর বাজার ও ব্রাহ্মসমাজ। (২) রাওল-পিণ্ডি বাজার ও আর্য্যসমাজ বুক্ ডিপো। (৩) বাঁকি-পুর বাজার। (৪) ভাগলপুর বাজার। (৫) আগ্রা বাজার। (৬) গোয়ালিয়ার লস্কর বাজার। (৭) বেনারস সিটী বাজার ও আর্য্যসমাজ বুক্ ডিপো। (৮) এলাহাবাদ আর্য্যসমাজ বুক্ ডিপো।

হিন্দি পুস্তক।